এই পৃথিবীর তিন কাহিনী

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন,
কলকাতা-৭০০০০৯

নারী, নগরী

এক

তাত্য়ানা আন্তনভকে আমি প্রথম দেখি য়েলিৎসা মিয়াতোভিচের ঘরে। রাত তখন প্রায় ন'টা ; য়েলিৎসা আর আমি নৈশ ভোজনের পর যথারীতি প্রাক্-নিদ্রা আড্ডা দিচ্ছি। আড্ডা হতো কোনোদিন আমার ঘরে, তিন নম্বরে, কখনও বা য়েলিৎসার ঘরে, পাঁচ নম্বরে। পাঁচ নম্বর ঘরের একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে তার আকৃতিতে প্রস্থের চাইতে দৈর্ঘ্য ছিলো বেশী, ঘরটিকে দেখে মনে হতো সরু লম্বা একটা করিডর। কিন্তু সে-কারণেই হোক, অথবা সে-ঘরের আশ্চর্য অধিকারিণীর ব্যক্তিত্বের গুণেই হোক, কি দিন কি রাত্রি সব সময়ই ঘরটিতে নীড়ের মতো একটা উত্তাপ জমাট হয়ে থাকতো। সে-রাত্রেও যথারীতি হলুদ পর্দা টানা, টেবিলবাতির স্বল্প আলো, আর জ্বলন্ত রেডিয়েটর। সে-ঘরে তখন আরও ছিলো [illegible] মরজ়ভ, য়েলিৎসার দেশের লোক। অবশ্য কেবল অংশতঃ, কারণ বে[illegible]ত জন্মালেও ইরিনা তার রুশ উত্তরাধিকারের কথা একেবারেই ভুলতে পা[illegible]নি, এমন কি সার্বিয়ানদের চেয়ে রুশরা যে কত বেশী উচ্চস্তরের জীব সে-[illegible]ও সে ছিলো নিঃসন্দিগ্ধ। ইরিনার ছেলেমানুষী দৃষ্টিভঙ্গিকে য়েলিৎসা ক্ষমা[illegible]ক্ষেই দেখতো। সে-দিনও ইরিনা যখন বিড়বিড় মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে তাস সা[illegible] আমার ভাগ্যগণনার চেষ্টা করছিলো, এবং ফাঁকে ফাঁকে বলছিলো তার মা কী দারুণ জ্যোতিষী,—দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি নাকি এক হাত-দেখার রুশ ভেল্কি দেখিয়েই সরল বেলগ্রেডবাসীদের ভুলিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন,—তখন য়েলিৎসা ওর কথায় বিশেষ কান না দিয়ে ভাবছিলো যে ইরিনা যদি এখনও না ওঠে তবে আর কিছু বাদেই ইচ্ছা ক'রে শেষ বাসটি হারাবে, এবং তার পর তাকে হেঁটে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ঠিক এই সময়েই পাঁচ নম্বর দরজায় টোকা পড়লো, এবং কী আশ্চর্য, ঘরে ঢুকলো রেডিয়টরের জন্য শিলিং-প্রার্থী হবু সন্ন্যাসী এডওয়ার্ড রায়ান নয়, একজন অপরিচিতা সুবাসিতা রূপসী আধুনিকা।

গড়পড়তা বাঙালী মেয়ের মতো ছোটখাট শরীর, মুখখানি যেন ইরানী রাজকুমারীর। মনে হলো লজ্জাচকিতা, এক নজরেই বুঝলাম বিদেশিনী। সন্দেহ রইলো না, যখন লজ্জাগ্রস্ত [illegible]চোখদুটি য়েলিৎসার দিকে তুলে এক নিঃশ্বাসে অনর্গল রুশ বলতে শুরু করলো। কথার তো[illegible]ব মধ্যে থেকে বুঝতে পারলাম বারবারই অবলিয়েনস্কি আর জ়ার্নভ দম্পতীদ্বয়ের নাম উচ্চারিত [illegible]চ্ছ। তখনই অনুমান করলাম ব্যাপারটা। পরে শুনলাম বিস্তৃতভাবে।

অক্স[illegible]ড এলাকায় স্লাভ সংস্কৃতির ছিটেফোঁটা যে যেখানে ছিলো, তাদের কারোরই নিস্তার ছিলো না [illegible] গ্রেগরিজ় হাউজ়ের কর্তৃপক্ষের নজর থেকে। তা ছাড়া, কি রুশ, কি

সার্ব, কি গ্রীক, কি দক্ষিণ ভারতীয়, কেউ প্রাচ্য অর্থডক্স গির্জার অন্তর্ভুক্ত হলে তো কথাই ছিলো না। সবাইকে যেনতেন প্রকারেণ ভুলিয়ে ধর্মকেন্দ্রিক চায়ের আসরের অছিলায় আদর-আপ্যায়ন ক'রে সন্তদের পুণ্য পতাকার নীচে জড়ো করাই ছিলো নিঃসন্তান স্নেহবুভুক্ষু জ়ার্নভ-দম্পতীর জীবনের ব্রত। প্রাচীনপন্থী খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্যগুণে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্রই জমায়েত হতেন তাঁদের স্নেহচ্ছায়ায়, এবং হিন্দুধর্মও বাদ যেতো না তাঁদের বিভিন্ন আসরের আলোচনা থেকে। তাঁদের চিন্তাধারায় খৃষ্টধর্মের পরেই ছিলো হিন্দুধর্মের স্থান। ভারতীয় হিন্দুদের সেন্ট গ্রেগরিজ় হাউজ়ে থাকাটা পর্যন্ত রেওয়াজে পরিণত হয়েছিলো।

টেইলরিয়ান ইনস্টিটিউটে রুশ ভাষার শিক্ষয়িত্রী হয়ে অক্সফোর্ডে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তাত্‌য়ানা এসে পড়লো সন্তদের পুণ্য গণ্ডীর ভেতরে। উপায়ান্তর ছিলো না তার। তাকে প্রথমেই প্রাক্তন রাজকুমারী অবলিয়েনস্কির গৃহে খাঁটি রুশ আতিথেয়তা গ্রহণ করতে হলো, অতঃপর অবিলম্বে পদার্পণ করতে হলো মিলিৎসা জ়ার্নভের একনায়িকাত্বের রাজত্বে। মিসেস জ়ার্নভ আগে থেকেই তাক করেছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্যারিস থেকেই খবর পেয়েছিলেন যে তাঁদের 'এমিগ্রে' সমাজের অন্যতম গুণবতী মেয়ে তাত্‌য়ানা আন্তনভ এক বছরের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈর্ষণীয় চাকুরি নিয়ে আসছে। অক্সফোর্ড শহরের রুশ তথা অর্থডক্স খৃষ্টীয় সমাজের অলংকার হিসাবে তাকে হরণ করবার জন্য সমস্ত জাল পেতে প্রস্তুত ছিলেন। চ্যাপেলের সমবেত গ্রেগরিয়ান সংগীতেও আর একটি দুর্মূল্য নারীকণ্ঠের যোজনা হবে এমন ভরসা রেখেছিলেন।

এক নম্বর ঘরের টিমথি ওয়্যার তখন জেরুজ়ালেমে হিব্রু শাস্ত্রে নিমগ্ন। তার গ্রন্থসমাকুল ঈষদন্ধকার একতলার ঘরে থাকতে এলো তাত্‌য়ানা। আমার ঘরের নীচেই। টিমথি থাকাকালীন তার গ্রামোফোন থেকে নিরন্তর গ্রেগরিয়ান সংগীতের যে-ওঠাপড়া এবং জোরালো আলোচনার সঙ্গে টিমথি-এডওয়ার্ডের কাষ্ঠভেদী যুগ্ম অট্টহাস্য তাদের ছাদ আর আমার মেঝে বিদীর্ণ করতো, তার বদলে এক নম্বরে এলো এক নতুন মার্জিত নীরবতা। মিলিৎসা আমাদের বললেন তাত্‌য়ানার সঙ্গে ভাব করতে, কিন্তু সাবধানে। প্যারিসের মেয়ে তো, কখন কী ভাবতে কী ভেবে বসে তার ঠিক নেই। অধিকাংশ সময়ই এক নম্বরের অভ্যন্তরে প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করা যেতো না। কারণ তাত্‌য়ানা অধিকাংশ সময়ই লাইব্রেরিতে থাকতো, এবং যে-সময়টুকু ঘরে থাকতো তখনও চুপ ক'রে পড়াশোনা করতো।

তাত্‌য়ানা প্রায় না খেয়েই থাকতো। সকালে এক কাপ কালো কফি আর দু'-একটি কৃশ বিস্কুট, দুপুরে ফিরলে এক চিলতে শুঁটকী হ্যাডক্ এবং আরেক কাপ কালো কফি, রাত্রে কখনও দুটি টোমাটো, কখনও দু' চামচ ভাত বা স্প্যাগেটি মাখন দিয়ে, এবং তৃতীয় কাপ কালো কফি। কালো কফি খেতো পড়াশোনার সময় ঘুম তাড়াবার জন্য। য়েলিৎসা আর আমি, যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব রান্নাঘরেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, রীতিমতো অবাক হতাম।

তাত্য়ানার সামনে একটা ডিপ্লোমা পরীক্ষা ছিলো—সেটা সে প্যারিসে উড়ে গিয়ে দিয়ে আসবে—সেজন্যে সে দিনরাত বই খুলে ব'সে থাকতো। আমরা তাই আরও বেশী ক'রে তার পুষ্টির জন্যে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তাত্য়ানা বলতো যে বেশী খেলেই ওর একটা পেটব্যথা হয়, কিন্তু আমরা জানতাম কম খেয়ে খেয়েই ও পেটের সর্বনাশ করেছে।[১] আমরা তাত্য়ানাকে আমাদের রান্না একটু-আধটু দিতে শুরু করলাম। প্রথমে লজ্জিত আপত্তির পর একটু-একটু খেতো, কিন্তু দু'-এক চামচের বেশী না। তাত্য়ানা প্যারিসের মেয়ে, নিশ্চয় খাঁটি কফির কদর বোঝে, এই ভেবে আমরা আমাদের সযত্নে পার্কোলেট করা কফি ওকে খাওয়াতে সচেষ্ট হলাম, কিন্তু কী আশ্চর্য, তাত্য়ানা খাঁটি কফির গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারতো না, নেস্ক্যাফেতেই ছিলো ওর সন্তুষ্টি।

তাত্য়ানা আমার কাছে আরজি পেশ করলো—ফেন না ফেলে দমে ভাত রাঁধতে শিখবে এই মর্মে। আমার কথামতো বাজারের নির্দিষ্ট দোকান থেকে ছোট প্যাকেটে বাসমতী চাল কিনে আনলো। ঠিকমতো রাঁধতে পারতো না কোনোবারই। চড়াবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ডেকচির ঢাকনা খুলে ওলটপালট করতো এবং ভাত টিপতে শুরু করতো। যখন বলতাম এখনও হয় নি, তখন বই হাতে ঘরে অন্তর্হিত হতো, কিন্তু দু' মিনিট পরেই আবার হাজির হতো আশান্বিত ব্যগ্র চোখে: 'ইজ্ ইত্ দান্, কেতকী ?' তখন আবার বোঝাতাম, চড়া আঁচে এত মিনিট, ফুটে গেলে ঢিমে আঁচে আরও এত মিনিট। এবার সে এত দীর্ঘকালের জন্য অন্তর্হিত হতো যে ভাত তলায় লাগতো। প্রায়ই দেখতাম টেইলরিয়ানে যাবার আগে ব্যস্তভাবে পোড়া বাসন মাজছে। শেষে ওর ধ্রুব বিশ্বাস হলো ঝুরঝুরে ভাত রান্না করার ম্যাজিক আর্ট ওর কখনো আয়ত্ত হবে না। তাত্য়ানা ভাত খেতো শুধু মাখন দিয়ে, কারণ অন্য কিছুর সঙ্গে খেলে ভাতের বিশিষ্ট স্বাদটা ও পেতো না। রীতিমতো ভাতরসিক ছিলো। শেষের দিকে শুধু ভাত-মাখন খেয়েই থাকতো। আমরা ওর আহারের প্রোটিনাল্পতায় আশঙ্কিত হতাম।

তাত্য়ানা উত্তাপের জন্য শিলিং খরচ করতে চাইতো না। হিমের মধ্যেও হিহি করতে করতে বই খুলে ব'সে থাকতো। অগত্যা আমরা ওর স্বাস্থ্যচিন্তায় কথাটা মিলিৎসাকে জানালাম। তিনি ওকে রাত্রে বসবার ঘরে ব'সে পড়বার অনুমতি দিলেন; সেখানে সেন্ট্রাল হীটিং ছিলো। অনেক রাত্রেও আমরা দেখতাম হয় সে-ঘরে নয় ওর নিজের ঘরে দরজার নীচে আলোর রেখা জ্বলছে।

গণ্ডগোল বাধলো মিলিৎসার উচ্চাকাঙ্ক্ষার দরুন। রুশদেশীয় খৃষ্টধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় বিশেষ সরব হতে দেখা গেলো না তাত্য়ানাকে। রোববার সকালে প্রার্থনাকক্ষে আসতে ওর দেরি হতো মধ্যে মধ্যে। এক-আধ দিন বেশী দেরি হয়ে গেলে আদৌ যেতে চাইতো না, বলতো, 'আমি যেতে বাধ্য নই।' গলা খুলে গাইতো না, বলতো, 'আমি গাইতে পারি না।'

একদিন ইংরেজীতে সার্ভিস হলো। রুশ সার্ভিসেরই অনুবাদ আগাগোড়া ; ইংরেজ গায়কগায়িকারা এলো। সেদিন দেখলাম ডাঃ জ়ার্নভ নিজে বহুক্ষণ কাকুতিমিনতি করছেন, আর তাত্যানা সংকুচিত হয়ে না-না করছে। তাত্যানা বলছে যে সার্ভিসটা ও বুঝতেই পারবে না, শুধু শুধু গিয়ে লাভ কী। 'আমি ধর্মের জন্য গির্জায় যাই, মজা করতে নয়। চ্যাপেল ইজ্ নত্ তেয়াত্র্।' অর্থাৎ চ্যাপেল থিয়েটার নয়। সেদিন একটু রাগই করেছিলাম তাত্যানার উপর, বৃদ্ধ জ়ার্নভকে নিরাশ করতে দেখে। কিন্তু আসলে তাত্যানা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো যে মিলিৎসার শাসনের ভিতরে সে কিছুতেই আসবে না। এমিগ্রে রুশ জীবনের বাঁধাধরা ছকের মধ্যে কিছুতেই ধরা দিতে চাইলো না সে।

টার্মের গোড়ায় সেন্ট গ্রেগরিজ় হাউজ়ের বাসিন্দাদের যে-সভা হয়, তাতে প্রত্যেককে দিতে হয় জাতি, ধর্ম, পেশা ইত্যাদি বিষয়ে আত্মপরিচয়। যখন তাত্যানার পালা এলো তখন জ়ার্নভ-দম্পতী পরম স্নেহভরে তাঁদের স্মিত দৃষ্টি তার মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে রইলেন। তাত্যানার রুশ রক্তে তাঁদেরই জয়কার। তাত্যানা ফরাসী মেয়েদের কায়দায় তার তনু অঙ্গ কিঞ্চিৎ সঞ্চালিত ক'রে দেয়ালের বাতির দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে বললো, 'আমি টেইলরিয়ানে রুশ ভাষার শিক্ষয়িত্রী, আমি অর্থডক্স, এবং আমি ফরাসী।' য়েলিৎসা আর আমি দৃষ্টিবিনিময় করলাম।

কয়েক মুহূর্ত বাদে এলো স্বয়ং মিলিৎসার পালা। তিনি কী বলবেন আমরা তা বুঝতে পেরেছিলাম।

তিনি বললেন, 'আমি সেন্ট গ্রেগরিজ় হাউজ়ের কর্ত্রী, আমি অর্থডক্স, এবং আমি রুশ, বিশুদ্ধ রুশ।' আমরা চোখ নামিয়ে ব'সে রইলাম।

তাত্যানা ইচ্ছে ক'রেই, মিলিৎসাকে চটানোর উদ্দেশ্যেই নিজেকে ফরাসী ব'লে ঘোষণা করেছিলো। পরে আমাদের বলে: 'কেনই বা নিজেকে রুশ রুশ ব'লে জাহির করবো? যে-দেশে জন্ম, যে-দেশের রুটিতে মানুষ, যেখানকার স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা, সে-দেশের নাম আগে বলবো, না বলবো সে-দেশের নাম, যে-দেশ ছেড়ে পূর্বপুরুষ পালিয়ে এসেছিলো? সহ্য করতে পারি না এমিগ্রে রুশদের দেশপ্রেম। বেশ তো, ফিরে যাও না নিজের দেশে। সেদিকে তো সাহস নেই। এদিকে বিশ বছর যাবৎ বৃটিশ নাগরিক হয়ে আছো ; এসেছিলে ফকির হয়ে, বৃটেনেরটা খেয়ে প'রে আজ মাতব্বর হয়েছো, অথচ পরিচয় দিতে গেলে বিশুদ্ধ রুশ!'

তাত্যানা আর মিসেস জ়ার্নভের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বেড়ে চলতে লাগলো। অবশেষে গোলমাল বাধলো ক্রিসমাসের ছুটির সূচনায়। তাত্যানা ছুটিতে প্যারিসে চ'লে যাবে, ছুটির ছ' সপ্তাহের জন্য সে ঘরভাড়ার অর্ধাংশ 'রিটেইনিং ফী' বাবদ দিতে প্রস্তুত নয়। মিলিৎসা নাছোড়, অক্সফোর্ডে ঘর ভাড়া নিলে এটাই নিয়ম, ছুটির পর একই ঘরে ফিরে

আসতে হ্লে ফী দিতে হয়। তাত্য়ানাও নোটিস দিয়ে দিলো, ছুটির পর তা হ্লে সে আর এই ঘর ভাড়া নিতে চায় না।

তখনই আরম্ভ হ্লো তুমুল কলরব। তাত্য়ানাকে ইংরেজী শেখাবার উদ্দেশ্যে মিলিৎসা নিয়ম ক'রে দিয়েছিলেন সে যেন সকলের সঙ্গে ইংরেজীই বলে, তাঁর সঙ্গেও। অগত্যা বেচারী তাত্য়ানা তার ঘর ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত বেশ নম্র গলায় তাঁকে জানালো— সহজ নিরলংকার চারটি ইংরেজী শব্দে : 'আই ক্যানত্ লিভ্ হিয়ার।'

মিলিৎসার চোখে জ্ব'লে উঠলো আগুন, মুখে ঘৃণা—'তাত্য়ানা আন্তনভ, হোয়াত্ দিদ্ ইউ সে ?'

'আই ক্যানত্ লিভ্ হিয়ার।'

তাত্য়ানা বলতে চেয়েছিলো, 'তা হ্লে—অর্থাৎ ফী দিতে হ্লে—আমাকে ঘর ছেড়ে দিতে হবে, আর্থিক কারণে।'

কিন্তু মিলিৎসা মানে করলেন, 'আমার পক্ষে এ বাড়িতে বাস করা আর সম্ভব নয়।' আত্মহারা হয়ে পড়লেন তিনি। দোতলার বারান্দা থেকে আমরা শুনতে পেলাম একতলায় তাঁর ক্রুদ্ধ উচ্চস্বর—'মাই দিয়ার গার্ল, ইউ ক্যানত্ সে দ্যাত্ ! স্পীক ইন রাশান প্লীজ় !' আর তার পর ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়তে লাগলো নারীকণ্ঠের রুশ, কখনও যুগপৎ দ্বৈত কণ্ঠে, কখনও দ্রুত লয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তরে।

পরদিন দুপুরে মিলিৎসা আমার ঘরে এলেন। 'কেতকী, তোমরা ওকে বোঝাও না। ওকে গুছিয়ে বলো। মেয়েটা রাগের মাথায় ঘর খুঁজতে বেরিয়েছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। সাধারণ ল্যাণ্ডলেডির সঙ্গে ও কি সুখী হবে ? এখানেই তো ওর আপনার জনেরা রয়েছে। য়েলিৎসা আর তুমি ওকে এ বাড়িতে থেকে যেতে অনুরোধ করো।'

আমরা অবশ্য বলেছিলাম আগেই। কিন্তু তাত্য়ানা রাজি হয় নি। বলেছিলো, 'ভেবো না। ঘর আমি পেয়ে যাবোই, আর সেটাই ভালো হবে। মিলিৎসার রাজত্বে টেঁকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমরা তো রুশ নও, তাই ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছো না। আমি রুশ ব'লেই আমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ নিজের করায়ত্ত করতে চান মিলিৎসা। আমার তা সহ্য হবে না। আমি থাকবো কাছাকাছিই, আসবো তোমাদের সঙ্গে গল্প করতে।'

আমাদের বাড়ি থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ অন্য এক বাড়িতে ইংরেজ বাড়িউলীর ঘরে উঠে গেলো তাত্য়ানা। ভাড়ার মধ্যে উত্তাপের খরচ ধরা আছে, আলাদা ক'রে শিলিং খরচ করতে হবে না। ফাঁকা বাড়ি, ভিড় নেই, যখন খুশি রান্নাঘর ব্যবহার করতে পারবে। তা ছাড়া পাবে ঘরে ব'সে চা তৈরি করার জন্য বৈদ্যুতিক কেটলি। পিছনের বাগানে সূর্যস্নানের সুযোগ অপর্যাপ্ত। বন্ধুরা ইচ্ছামতো আসবে যাবে, কোনো নিষেধ নেই। সবার উপরে ছুটিছাঁটায় 'রিটেইনিং ফী' লাগবে না। যাবার সময় মিলিৎসার সঙ্গে বিশেষ সদালাপ হ্লো না। চোখদুটি ছলছল হয়ে এলো ডাঃ জ়ার্নভের—'তোমার জন্য দরজা সব সময়ই খোলা রইলো

কিন্তু। ইচ্ছে হলেই আবার ফিরে এসো। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে অবশ্যই আসবে। আর—' থমকে গেলেন বৃদ্ধ, থেমে বললেন—'রোববার রোববার সকালে চ্যাপেলে আসবে তো?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়।'

ডিসেম্বরে য়েলিৎসা বেলগ্রেডে ফিরে গেলো। জানুয়ারি মাসে তাত্য়ানা প্যারিস থেকে অক্সফোর্ড ফিরলো। এক রোববার সকালে বেলা বারোটা নাগাদ আমার দরজায় টোকা। নতুন একটি ঘিয়ে রঙের পোশাকে তাত্য়ানা।

'চ্যাপেলে এসেছিলাম।'

'কফি খাবে?'

'হ্যাঁ, নেস্ক্যাফে কিন্তু!'

'জানি, মনে আছে!'

যাবার সময় য়েলিৎসা আমাকে ব'লে গিয়েছিলো তাত্য়ানা প্যারিস থেকে ফিরে এলে ওর সঙ্গে ভালো ক'রে ভাব করতে—'মেয়েটা খামখেয়ালী, ওর একটু দেখাশোনা কোরো। এমনিতে অহংকারী, প্যারিসিয়েন্ তো, কিন্তু আসলে সঙ্গ চায়। সেধে ভাব করবে না, কিন্তু ভাব করলে খুশী। তা ছাড়া তুমিও ভালো সঙ্গী পাবে। আমি তো চললাম, তোমার তাত্য়ানা রইলো।'

শীগগিরই তাত্য়ানার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলো। স্লাভদের সঙ্গে আমার এই গূঢ় যোগ দেখে মিলিৎসা বিস্মিত হলেন। 'প্রাচ্য যোগ' ব'লে কথাটার তা হলে সত্যিই অর্থ আছে?

তাত্য়ানার ঘরখানি ছিলো সুন্দর। ও অনাহারী ছিলো দেখে আমি প্রায়ই ওকে জোর ক'রে আমার সঙ্গে খাইয়ে দিতাম। ও আবার আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে রাত দশটার সময় নেস্ক্যাফে খাওয়াতো। একদিন আমি বললাম, 'তাত্য়ানা, আইরিশ কফি খেয়েছো?'

'সে কী রকম?'

'কিছুই না, প্রথমে বাদামী চিনি, তার পর কালো কফি, তার পর কয়েক চামচ হুইস্কি, তার উপর ক্রীম।'

'কী আশ্চর্য, আমার কাছে আধ-বোতল হুইস্কি আছে। বেশ তো, দেখা যাক।'

সেই আধ-বোতলে আমাদের দু' মাস আইরিশ কফি খাওয়া হয়ে গেলো। তাত্য়ানা কার জন্য হুইস্কি কিনেছিলো সেটাও ক্রমে জানতে পারলাম।

[১] আজ মনে হয়, তাত্য়ানার মধ্যে আনোরেক্সিয়া নার্ভোসা-র (anorexia nervosa) বা আহারে অনীহারূপ তরুণীসুলভ মানসিক সমস্যার লক্ষণ কিছুটা ছিলো, কিন্তু সেকালে ডাক্তাররা সাধারণতঃ ওরকম কোনো ডায়াগ্নসিস করতেন না। [২০০৫]

দুই

ক্রমশঃ আমি তাত্‌য়ানা আন্তনভ-নামক মানুষটির মনের বিভিন্ন চাবিকাঠির মোচড়, তার কলকব্জার নড়াচড়া বুঝতে শুরু করলাম। স্মিতহাস্য রঙিন ঠোঁট-দুটি, স্বচ্ছ সুন্দর চোখ, সর্বদাই মুখখানির পিছনে একটা বিষণ্ণতার আভাস আবছাভাবে উঁকি দিতো। হয়তো অনেক উৎসাহ নিয়ে তার ছাত্রদের কথা বলছে, বা বলছে টেইলরিয়ানের আগামী রুশ নাট্যাভিনয়ের প্রস্তুতির কথা; হয়তো চলছে ইংরেজ মেয়েদের জামাকাপড় নিয়ে রসিকতা কিংবা ইংরেজ জীবনের কোনো দিক নিয়ে বিশুদ্ধ খিস্তি;—হঠাৎ যেন সব অর্থহীন মনে হয় তাত্‌য়ানার কাছে, ক্লান্তি আসে তার সমস্ত আলোচনায়, নিমেষে সে তার সমস্ত উৎসাহ্ হারিয়ে বসে—কি ভবিষ্যতের স্বপ্নে, কি অতীতের প্রশংসায়, কি বর্তমানের সমালোচনায়। আস্তে আস্তে তাকে আমি প্রশ্ন করি প্যারিসের বিষয়ে, ইংলণ্ডে তার অভিজ্ঞতার বিষয়ে। প্যারিস তার কাছে অসম্ভব আপনার, এবং প্রাণোচ্ছলতার প্রতীক; আবার কখনও কখনও প্যারিস বন্দীশালা। অক্সফোর্ড রমণীয় শহর, কি স্থাপত্যে, কি প্রকৃতিতে, কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা একটু মজার; সকলেই খুব একটা চালাক নয়, অথচ কেউ কেউ অসম্ভব তীক্ষ্ণ, অসম্ভব ক্ষুরধার। কখনও অক্সফোর্ড-প্যারিস দুইই বন্দীশালা, কখনও দুইই খোলা মাঠ।

অনুমান করলাম, প্যারিস তো বটেই, অক্সফোর্ড সম্পর্কেও এই ক' মাসেই তার করুণরঙিন কোনো বিশেষ অনুরাগ জন্মেছে। ক্রমে ক্রমে তাকে বলতাম, 'তাত্‌য়ানা, বলো তোমার মনের কথা।' প্রথম প্রথম হেসেই উড়িয়ে দিতো—'তোমাদের সব ঐ এক দিকেই নজর। সেসব কিচ্ছু না।'

আমি বলতাম, 'কেন বিশ্বাস করবো ? তোমার বয়স কত ?'

'উনত্রিশ।'

'তবে ? না হয়েই যায় না। প্যারিসিয়েন্ তুমি। না জানি কত রূপকথা তোমাকে ঘিরে আছে।'

আস্তে আস্তে সবই বলেছিলো— যতটা পরিষ্কার ক'রে ও বলতে পারে। কারণ আজ পর্যন্তও আমি জানি না তাত্‌য়ানা সত্যি কী চায়। জানে না সে নিজেও। এবং সেটাই ওর জীবনের থিওরি। অর্থডক্স ব'লে নিজেকে ঘোষণা করলেও বস্তুতঃ মূল অর্থে তাত্‌য়ানা ছিলো অ্যাগ্‌নস্টিক, অজ্ঞেয়বাদী। কিছুই জানা যায় না। 'যায় কি, সত্যিই তাই কি,' বা 'তুমি কি সত্যিই তাই মনে করো, কিন্তু...'— এ ধরণের দৃষ্টিকোণ ছিলো তার পক্ষে মার্কামারা। মিলিৎসা জ়ার্নভের ধরণের রুশ জাতীয়তাবাদ সে বরদাস্ত করতে পারতো না, অথচ তার

সমস্ত ফরাসী আচারব্যবহারের অন্তরালে ছিলো রুশ সংস্কৃতির প্রতি এক তীব্র অনুরাগ। দুঃখ ক'রে বলতো, তার জেনারেশনের এমিগ্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রুশ ভাষায় কথাবার্তা বলা দুর্লভ হয়ে আসছে, পরবর্তীরা আর বলবে না, তারাই শেষ রুশভাষী। আবার এটা যে অবশ্যম্ভাবী তাও স্পষ্টই স্বীকার করতো। যুব-উৎসব উপলক্ষ্যে ও দুবার মস্কো গিয়েছিলো। তাই বলতো—'মিলিৎসা যে-রাশিয়া ছেড়ে এসেছেন সে তো আর নেই। উনিশ বছর বয়সে দেশ ছাড়ার পর তিনি আর ওমুখো হন নি। এখনকার রুশরা কী বলছে, কী ভাবছে, তা তিনি জানতে চান না, দূরে সরিয়ে রাখতে চান। তাই তো তাঁর রুশ ব'লে নিজেকে জাহির করাটা অগভীর মনে হয়। জানি মিলিৎসা আর দেশে ফিরে যেতে চান না। কিন্তু এখনকার যারা রুশ নাগরিক, তাদের সঙ্গে কথা ব'লে দেখেছি, তারাও যে আর কখনো ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ফিরে যেতে চায় না, সেটাও অনুধাবনযোগ্য তথ্য নয় কি?'

পারিবারিক জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, ছেলেবেলায় ও নাকি তা জানে নি। এর তাৎপর্য প্রথমে বুঝি নি, তবে ওর কথাবার্তায় সর্বদাই মায়ের উল্লেখ এবং পিতৃপ্রসঙ্গের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি থেকে অনুমান করেছিলাম ওর মা স্বামিপরিত্যক্তা। সে-অনুমান মিথ্যা হয় নি। সর্বন্-এ তাত্য়ানার সুনাম ছিলো ভালো মেয়ে, পড়ুয়া মেয়ে হিসেবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে লাইব্রেরি, রাতে লাইব্রেরি থেকে ফিরে সটান বিছানা। বইয়ের জগৎ ছাড়া বিশেষ কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলো না, একমাত্র অর্থডক্স গির্জার পরিপার্শ্ব বাদে। রোববার রোববার গির্জায় যেতো, এমিগ্রে রুশ সম্প্রদায়ের সাহায্যের জন্য নানারকমের গির্জাপরিচালিত সমাজকল্যাণসংস্থাতেও কাজ করেছে, বিশেষতঃ শিশুবিভাগে। কলেজে ছুটি হ'লে স্কুলের শিশুদের ক্যাম্পিং-এ নিয়ে যেতো।

'আমার বয়স যখন আঠারো তখন একজন আফগান ছাত্রকে আমার ভালো লাগে। তুমি প্যারিসে গেলে তোমাকে ছবি দেখাবো। অত্যন্ত সুপুরুষ, প্রিয়দর্শী ছিলো আমার আফগান। ব্যবহারে এবং আলাপেও মধুর। ওদের সমাজ আমাদের থেকে অনেক আলাদা; সেখানে মেয়েদের স্থানও ভিন্ন রকমের। ও অবশ্য উচ্চশিক্ষিত এবং রুচিসম্পন্ন ছিলো। তখন আমি পূর্ণতঃ প্রস্তুত ছিলাম সব ছেড়ে দিয়ে ওর সঙ্গে চ'লে যেতে এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করতে। কিন্তু ওকে হঠাৎ দেশে ফিরে যেতে হ'লো। ও এসেছিলো ওর সরকারের একটা বৃত্তি নিয়ে; ওর সামনে ছিলো কর্মজীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। তখনই হঠাৎ স্থির হয়ে গেলো ওকে কূটনৈতিক জীবন বেছে নিতে হবে। কূটনৈতিক চাকরিতে বিদেশী মেয়ে বিয়ে করা যায় না। আমাকে বিয়ে করতে হ'লে ওকে আফগানিস্তানের উজ্জ্বল কর্মজীবন সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হবে, হয়তো চাকরি খুঁজতে হবে ফ্রান্সে এসে। ও ছিলো গভীর দেশপ্রেমিক, আদর্শবাদে অনুপ্রেরিত আধুনিক যুবক। আফগানিস্তানের দরকার ওর মতো কর্মী ছেলের। ওকে দেশগঠনের কাজে থাকতে হবে। ও কি বিদেশে চ'লে আসবে, বিদেশের অন্নপ্রার্থী হবে, শুধু একটি মেয়ের জন্য? কোনো আফগান বোধ হয় একটি মেয়ের জন্য এতটা করতে পারে না।

আমার আফগানও আমার আর আফগানিস্তানের মধ্যে আফগানিস্তানকেই বেছে নিলো। ও আমাকে অনেক দিন মনে রেখেছিলো, চিঠি লিখতো। এখন ও বিয়ে করেছে; কূটনৈতিক জীবনে বিয়ে করাটা দরকার। এখনও আমাকে ও ভোলে নি। এখন ও আছে ওয়াশিংটনে, উচ্চপদে। আমি জানি, আমি যদি কখনও আমেরিকা যাই, চাকরিবাকরি টাকাপয়সা কোনো ব্যাপারে মুশকিলে পড়ি, ও অকুণ্ঠভাবে আমাকে সাহায্য করবে।

'পুরো আট বছর আমি ওর প্রেমে নিবদ্ধ ছিলাম। আঠারো থেকে পঁচিশ, জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। ও প্যারিস ছেড়ে চ'লে যাবার পর বছরের পর বছর ওর চিন্তা মনের মধ্যে লালন করেছিলাম। আমিও প্রাচ্য কিনা। আমার মা আরমানী। আমি তাই অর্ধেক রুশ, অর্ধেক আরমানী। আমার সঙ্গে ওর বিশেষ মানসিক যোগ ছিলো। ওর মতো আমিও ছিলাম আধুনিক চিন্তায় অনুপ্রেরিত, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে উৎসুক। তা ছাড়া সবাই বলে আমাকে নাকি মধ্যপ্রাচ্যের মেয়েদের মতো দেখতে। তুমিও তো বলো। লাইব্রেরিতে বই খুলে ঠায় ব'সে থাকতাম, ওর ধ্যান করতাম। ফরাসী যুবকরা আনাগোনা করতো, পাত্তা দিতাম না।

'এইভাবেই আট বছর কেটে গেলো। কখন দেখি উৎসাহী ফরাসী ছেলেদের মধ্যে একজনের সঙ্গে আমার আলাপ জ'মে গেছে। ছেলেটি আমার প্রতি অসম্ভব অনুরক্ত। এ আমার বয়সী, তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরধার ছাত্র। এখনও ছাত্র, চিরকালই থাকবে—আমার মতোই! গবেষণার পর গবেষণা, তার ওপারেও গবেষণা। ওকে আমি সম্পূর্ণ বুঝতে পারি না—ও একটা রহস্য। কখনও কখনও মনে হয় ও আমার সঙ্গে ঝগড়া করতেই ভালোবাসে, কিন্তু আসলে ও প্রচণ্ড অভিমানী। জানো, ও আমাকে গত তিন-চার বছর জ্বালিয়ে খেয়েছে। ও জানে বন্ধুত্ব এবং মানবিক সঙ্গের ব্যাপারে আমি ওর উপর নির্ভরশীল, ওকে ছাড়া আমার চলে না। সর্ববিষয়ে ও-ই আমাকে সাহায্য করে—কি মস্কো যুব-উৎসবে যাবার অনুমতি পেতে, কি প্যারিসে চাকরি জোগাড় করতে, কি ইংলণ্ডে চাকরির জন্য দরখাস্ত লিখতে। আমাদের পরিবারের সাংসারিক সবরকম ব্যাপারেই ওর সাহায্য পেয়েছি। আমাদের বাড়িতে আসে, মা ওকে খুবই পছন্দ করেন। মা চান আমি ওকে বিয়ে করি। ও বহুবার বলেছে। এই ইংলণ্ডে আসবার আগেও। আমি ওকে বলেছি আমাকে আরও দু' বছর সময় দিতে। তুমি জানো, ওকে বিয়ে করবো কি করবো না, এ কথা ভেবে ভেবেই আমার পেট-ব্যথাটা হয়েছে? ও যে জানে ওকে ছাড়া আমার চলে না—আমার আর কোনো ভালো বন্ধু নেই।

'কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে যে উৎসাহ পাই না। তাতে ওর কি কম অভিমান? ও দারুণ কথা বলতে পারে—ওর কথার জালে জালে আষ্টেপৃষ্ঠে ও আমাকে বেঁধে ফ্যালে, আমি নিঃশ্বাস ফেলতে পারি না। নিভৃতে এক বছর চিন্তা করার জন্যই আমি অক্সফোর্ডে এসেছি। প্যারিসে ওর আওতায় ওর সম্পর্কেই কী ক'রে স্বাধীন চিন্তা করবো বলো? কিন্তু এখানেও ওর প্রভাব। সমানে উপহার পাঠাচ্ছে, পাঠাচ্ছে চিঠি। সেদিন একটা চিঠি পেলাম—লণ্ডনের

ভিক্টোরিয়া স্টেশনে অমুক দিন অমুক সময়ে উপস্থিত থেকো। যখন চিঠি পেলাম তখন সে-তারিখ পার হয়ে গেছে। বেচারী লণ্ডনে এসে ঘুরে গেছে আমাকে না পেয়ে।

'গত টার্মে টেইলরিয়ানে ছেলেমেয়েদের রুশ নাটকের মহড়ার ব্যাপারে এক ইংরেজ যুবকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমার চাইতে দু'-এক বছরের বড় হবে। খুব বুদ্ধি, জীবনযাত্রায় বোহিমিয়ান। ওর মাথার সামনের দিকটাতে একটু টাকের মতো আছে—হেসো না, খানিকটা শেক্সপীয়রের প্রচলিত মূর্তির মতো,— এলিজ়াবিথান ছবিটবিতে যেরকম দেখা যায় না ? ওকে খানিকটা ঐরকমই দেখতে। এই দ্যাখো ছবি। কেমন, ঠিক না ?—'

সত্যিই অবাক হলাম। গ্রীনরুমে একরাশ ছেলেমেয়ের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটি যুবক, ঠিক যেমন ছবিতে দেখেছি শেক্সপীয়র এক কোণ থেকে দেখছেন *মেরি ওয়াইভ্‌স্‌ অফ উইণ্ডসর*-এর প্রথম অভিনয়।

'—ওকে আমি প্রথম প্রথম সুদর্শন মনে করতাম না। প্রথমে বিশেষ আকৃষ্ট হই নি। যখন ইংরেজী কায়দায় চা-কফি খেতে বা থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাইতো, খুব একটা আগ্রহ দেখাতাম না। কিন্তু রিহার্সালের ব্যাপারে ক্রমশঃই বুঝতে পারলাম রুশ আর ফরাসী এই দুই ভাষা আর সাহিত্যের উপর কী দারুণ ওর দখল। দেখলাম কী সূক্ষ্ম ওর বিচারবোধ। আমার সঙ্গে ও যে-বিশুদ্ধ ফরাসীতে কথা বলে, তা একজন ইংরেজের পক্ষে অভাবনীয়। প্যারিস ওর অসম্ভব ভালো লাগে। আমাদের নানান সাধারণ কৌতূহল ছিলো, তারই মাধ্যমে পরিচয় দৃঢ় হলো।

'প্রথম টার্মের শেষের দিকে আমি তো প্রায়ই টেইলরিয়ান থেকে বেরিয়ে ওর সঙ্গে উইম্পি বারে লাঞ্চ খেতাম। নিশ্চয় মনে আছে, তোমরা মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি দুপুরে খেতে ফিরি নি কেন, আর আমি বলতাম বাইরে খেয়ে নিয়েছি ? উইম্পি বারে তোমরা খাও না কেন ? কী সস্তা ! একবার খেয়ে দেখো।—

'—যাই হোক, যা বলছিলাম, ওর সঙ্গে ক্রমশঃ আমি এত ঘুরতে শুরু করলাম যে আমার ছাত্ররা তো বটেই, রুশ বিভাগের প্রোফেসাররাও তা লক্ষ্য করলেন। কেনাকাটা করতে হলে ও আমাকে দোকানে নিয়ে যেতো। অপেরায় নিয়ে যেতো। নিয়ে যেতো বাড়িতে কফি খেতে, অক্সফোর্ডের একটু বাইরে। আমিও ওকে দু'-একদিন কফি খাইয়েছি। এই হুইস্কি তো ওর জন্যই কিনেছিলাম। তখন যদি আইরিশ কফি বানাতে জানতাম, ওকে অবশ্যই ক'রে খাওয়াতাম !

'মিলিৎসার সঙ্গে গণ্ডগোল বাধবার পর এই নতুন ঘর খুঁজে বার করতে ও-ই তো আমাকে সাহায্য করলো। ওর উপর ভরসা ক'রেই তো হঠাৎ অমন ক'রে নোটিস দিতে পেরেছিলাম। আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হলাম। এখন তো আমার চোখে ও দারুণ সুপুরুষ। ও বলেছিলো ছুটিতে ও প্যারিসে যাবে, দুজনে অনেক বেড়াবো এরকম স্বপ্ন দেখেছিলাম।

'কিন্তু এক সন্ধ্যায় একটা পার্টির পর ওর বাড়িতে ও যেন বড্ড নেশাগ্রস্তের মতো আচরণ করতে লাগলো। মদের নেশার কথা বলছি না। এ হলো আধুনিক যুবকদের ইচ্ছাকৃত বোহিমিয়ান নেশা।

'আমাকে একটা সোফায় বসিয়ে ও বসলো আমার পায়ের কাছে, কার্পেটে। ও বললো ও বুঝতে পেরেছে আমি ওর প্রেমে পড়েছি। কিন্তু ও নাকি কাউকেই ভালোবাসতে পারে না। ওর টেবিলের উপর গোটা দুই রূপসী মেয়ের ফোটোগ্রাফ ছিলো ; অনুমান করি ওর প্রথম যৌবনে ও কিছু ঘা খেয়েছে। লক্ষ্য করেছিলাম মেয়েদের ভালোবাসা সম্পর্কে ও একটা সীনিকাল মত পোষণ করতো। সন্দেহ করি, ওর প্রথম অভিজ্ঞতাগুলোকে ও এখন স্বেচ্ছাচারের অজুহাতে পরিণত করেছে। নইলে ওর জীবন থেকে ভালোবাসা কেন শুকিয়ে যাবে ?

'ও আমাকে বললো, ও চেষ্টা ক'রে দেখেছে, কিন্তু ও আর কোনো মেয়ের প্রেমে পড়তে পারে না। অথচ জৈব আকর্ষণ ঠিকই অনুভব করে ! ও আমাকে বললো ওর সঙ্গিনী হতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কত দিনের জন্য ? ও বললো, এক বছর, দু' বছর, যত দিন ভালো লাগা টেঁকে। হয়তো তার মধ্য থেকেই ভালোবাসার সূত্রপাত হবে।

'যখন কথা বলছিলাম তখন রাত বেশ হবে। একটি ইংরেজ মেয়ে—বীটনিক ছাত্রী—ওর সঙ্গে দেখা করতে এলো। ও মেয়েটিকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে কী যেন বললো, মেয়েটি চ'লে গেলো। হয়তো মেয়েটিকে বলেছিলো, আজকে হবে না। সেই মুহূর্তের মধ্যেই আমি আকাশপাতাল একসঙ্গে ভেবে নিলাম। ওর প্রস্তাবে আমি রাজি হই নি।'

'বেশ করেছো,' ব'লে উঠি আমি।

'কিন্তু ঠিক করেছি কি সত্যি ? এখনও যে ওকে ভুলতে পারি না। আমিও আকৃষ্ট হয়েছিলাম তো। মনে হয়, কী জানি, হয়তো আনন্দের সুযোগ আমার হাতে এসেছিলো, আমি না জেনে ফিরিয়ে দিয়েছি। আমি কি শুধু সংসারের পুতুল হয়ে গেলাম ? হয়তো সত্যিই সান্নিধ্য থেকে প্রীতির উৎপত্তি হতো ? হয়তো আমি ওকে বোহিমিয়ান জীবন থেকে ফিরিয়ে আনতে পারতাম। রাজ্যের বোকা বোকা মেয়ের সঙ্গে মেশে আজকাল, যারা ওকে মোটেই বোঝে না। এই তো সেদিন দেখলাম মোমের পুতুলের মতো এক দোকানদারনী মেয়েকে লণ্ডন থেকে তুলে এনেছে কোনো এক পার্টির জন্য। কষ্ট হয়। জানো, ও কী অবাক হয়েছিলো আমি উনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত কুমারী আছি শুনে ?'

'শয়তান !'

'তুমি তো বলবেই। তোমাদের ঐতিহ্য আলাদা। আমাদের ইয়োরোপীয় সমাজ সেরকম নয়। আমি তো এ বিষয়ে ব্যতিক্রম। ইংলণ্ড-ফ্রান্সে কী দেখছো ? ফ্রান্সে তো আধুনিক যুবক-যুবতীরা সম্পূর্ণই বৈষয়িক কারণে বিয়ে-থা করে। প্রেমে পড়া তো পুরোনো

হয়ে গেছে। আমি বাড়ির শিক্ষাদীক্ষায় রুশ-আরমানী কিনা, আমি তাই আজকাল প্রাচীনপন্থী হয়ে গেছি।' হেসে ওঠে তাত্যানা।

'তুমি ঠিকই করেছো,' বলি আমি, 'ওভাবে আত্মোৎসর্গ ক'রে কোনো স্বেচ্ছাচারী যুবককে সৎপথে আনার কোনো অর্থ হয় না। ইট ইজ় নট ওয়র্থ ইট। বিশেষতঃ সে যখন স্নেহে অক্ষম এবং সে-কথা রূঢ়ভাবে মুখের উপরেই ব'লে দিচ্ছে।'

'ঠিক, ঠিক, আমি খুব আঘাত পেয়েছিলাম সে-কথায়। আর কী মাতব্বর জানো? আমাকে বোঝালো আমি নাকি "ভিন্ন ধরণের" মেয়ে, ভালো মেয়ে। আমার কাছ থেকে ওর স'রে যাওয়াই ভালো। আমি নাকি "সীরিয়াস" মেয়ে, আমি ওকে বাধ্য করি চিন্তা করতে—যেটা সে নিতান্ত অপছন্দ করে—এবং আমার মতো মেয়েকে তলিয়ে দেখবার মতো অপর্যাপ্ত সময় ওর নেই। ছোটখাট অ্যাফেয়ারেই ও তৃপ্ত। সুতরাং আর কেন। তাই ও একেবারে সেদিন থেকেই আমাকে নির্মমভাবে ত্যাগ ক'রে গেছে। মুখে ব'লে গেছে কায়দাদুরস্ত ভদ্রতায়, মধ্যে মধ্যে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এখনও আছে অক্সফোর্ডে, আসে টেইলরিয়ানে। কিন্তু লাঞ্চ খেতে যায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে হৈচৈ করতে করতে, মাদমোয়াজ়েল আন্তনভকে আর ডাকে না।

'একদিন দেখেছিলাম কর্নমার্কেট স্ট্রীটে, একটি ইংরেজ মেয়ের বাহুলগ্ন হয়ে উলওয়র্থ ক্যাফেটেরিয়ায় যাচ্ছে। আমিও খেতে বেরিয়েছি। দেখা হ'লে একসঙ্গে খেতে যাওয়া জানোই তো অক্সফোর্ডের বাঁধাধরা নিয়ম। ও কিন্তু অনেক মৌখিক ভদ্রতা করলো, অথচ একবার জিজ্ঞাসা করলো না, "কী, কোথায় খেতে যাচ্ছো, আমাদের সঙ্গে এসো না!" প্রথম টার্মে যারা যারা আমাদের একত্র দেখেছিলো তারা সবাই না জানি কী ভাবে। আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারি না। রুশ সেমিনারের প্রোফেসারেরা কী ভাবেন কে জানে। হয়তো অবলিয়েনস্কি এবং জ়ার্নভেরও কানে যাবে, প্যারিস পর্যন্তও পৌঁছবে। ও ছুটিতে ঠিকই প্যারিসে গিয়েছিলো। আমার ঠিকানা ফোন নম্বর সবই ছিলো ওর কাছে। একবারও দেখা করে নি।'

পরীক্ষার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাত্যানাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কাজও করতে থাকি। মাঝখানে ঈস্টারের ছুটিতে ও আরেকবার প্যারিস ঘুরে এলো। তার পর এলো শেষ টার্ম, তথাকথিত গ্রীষ্মের টার্ম। এ সময়ে বিভিন্ন কলেজে নৃত্যোৎসব হয়। ইংরেজ বান্ধব খোয়া যাওয়ায় তাত্যানা যোগদানের আশা ছেড়ে দিয়েছিলো। অথচ ওর দারুণ কৌতূহল আর আগ্রহ ছিলো সে-বিষয়ে। ওর ধারণা, আগেকার দিনের মতো এখনও রোম্যান্টিক আছে ব্যাপারটা। ভাবলাম, ধারণাটা ভাঙার জন্যও ওর যাওয়া দরকার। সঙ্গীও জুটে গেলো একজন। বেলিয়ল কলেজের নৃত্যোৎসব উপলক্ষ্যে একজন শ্যামদেশীয় ছাত্র খর্বাঙ্গী সঙ্গিনী খুঁজছিলো, ইংরেজ মেয়েদের মধ্যে জুটছিলো না। তাত্যানাকে স্নান-প্রসাধন করিয়ে লম্বা সাদা পোশাকে পাঠিয়ে দিলাম। সারা রাত জাগবার জন্য তৈরি থাকলেও রাত দু'টোর মধ্যেই

ও ফিরে এসেছিলো। শুধুই নাকি টুইস্টের মাতামাতি ; তা ছাড়া ছেলেটিও কাঠখোট্টা, প্রাচ্য ছেলেরা সাধারণতঃ যেরকম নম্রমধুর হয় মোটেও সেরকম নয়।

'ব্যাড্ লাক্, তাত্য়ানা !' বলি আমি।

এক-একদিন রাত দশটার পর আমরা দুজনে বেরোতাম নৈশ বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে। হয় ব্যানবেরি নয় উডস্টক রোড ধ'রে। আমাদের অন্য উদ্দেশ্য—প্রকাশ্যে অস্বীকৃত—ছিলো ফুল তোলা। আমাদের মতে এটা মোটেই চুরির পর্যায়ে পড়তো না, কারণ আমরা শুধু তুলতাম বড় বড় গাছের ফুটপাথপ্রসারী শাখা থেকে বিলম্বিত মঞ্জরী। গৃহস্থবাড়ির গাছের ডালপালা যদি ঋতুর গুণে স্ফীত হয়ে ফুটপাথের উপর অকৃপণভাবে নত হয়ে পড়ে, ঝুলিয়ে দেয় তার পল্লবিত বল্লী, থরে থরে বাড়িয়ে দেয় তার পুষ্পরাশি, তা হলে আমরাও কি অকুণ্ঠিত হস্তে সে-অমৃতদানের অংশ গ্রহণ করবো না? অত রাত্রে ডালপালা ফুলপাতা হাতে দুটি মেয়েকে হাঁটতে দেখলে ইংরেজরা অবশ্য ঠিকই ফিরে তাকাতো। আমরা তখন চোরাই মাল লুকানোর চেষ্টা করতাম। কখনও বা দূরে গাড়ি দেখলে পুলিশের গাড়ি ভেবে সটান কোনো গলিতে ঢুকে পড়তাম। সে-অনুমান কয়েকবার সত্য হয়েছিলোও।

একরকমের ঝুলন্ত হলুদ ফুল আমাদের খুব প্রিয় ছিলো।[১] সেটা কিন্তু ফুলদানীতে মোটেই থাকতো না, পরদিন সকালেই বিশীর্ণ হয়ে যেতো। কিন্তু দু'-একদিন আমরা করতাম সত্যিকারের অপহরণ। সেটা করা হতো সেন্ট গ্রেগরিজ় হাউজ় থেকেই। আমাদের বাগানে একজোড়া মনোমুগ্ধকর লাইলাক গাছ ছিলো; তাদের ফুলের বর্ণ আর ঘ্রাণ দুইই ছিলো আমাদের দুজনকার বিশেষ প্রিয়। মিলিৎসার ভয়ে দিনের বেলা কখনো সে-গাছ ছুঁতে সাহস পেতাম না। রাত এগারোটায় আসতো চয়নের সুবর্ণসুযোগ। তার পর বাগানের দরজায় আমি তাত্য়ানাকে গুডনাইট জানাতাম ; সেও দ্রুত পদক্ষেপে গলির বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতো।

আমার পরীক্ষার সময় তাত্য়ানা আমাকে অনেক সাহায্য করলো—য়েলিৎসা থাকলে যেমন করতো। মিলিৎসা দেখতে লাগলেন হরদমই তাত্য়ানা আমার কাছে যাতায়াত করছে, আমার জন্য বাজার ক'রে আনছে, কিনে আনছে রাশি রাশি ফল। বাসন ধুয়ে দিচ্ছে, খাবার জায়গা ক'রে ডাক দিচ্ছে। একদিন আমার ঘরে এসে দেখেন তাত্য়ানা আমার বিছানা করছে, আমি পড়ছি ; অন্য একদিন, আমি যথারীতি পড়ছি, আর শ্রীমতী আন্তনভ নিবিষ্ট মনে আমার একটা পুরোনো সায়া মেরামত করছে।

পরীক্ষার সপ্তাহে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় ও আসতো আমার খোঁজ নিতে। পরীক্ষার মাঝামাঝি এক শনিবার বিকেলে সেন্ট গ্রেগরিজ় হাউজ়ে যথারীতি গ্রীষ্মকালীন উদ্যান-পার্টির আয়োজন হলো। আমি জোর ক'রে তাত্য়ানাকে আমার অতিথি হিসেবে আনলাম। মিলিৎসা নির্বাক। ডাঃ জ়ার্নভ যেখানে যেখানে আমাকে 'এই যে আমাদের ভারতীয় মেয়ে' ব'লে টেনে নিয়ে যান, আমিও সেখানে সেখানে টেনে নিয়ে যাই তাত্য়ানাকে, 'আমার প্যারিসের বান্ধবী'

ব'লে। বাড়ির ছেলেরা সবাই তাত্য়ানাকে পছন্দ করতো। এডওয়ার্ড আমাদের নাসপাতি গাছের[২] নীচে ডেকে চুপি চুপি বললে, 'এই টেবিলেই আছে মিলিৎসার স্বহস্তে প্রস্তুত পাঞ্চ, অতি মনোরম। কিন্তু মিলিৎসার উদ্দেশ্য সবাইকে বেশী ক'রে চা খাইয়ে পেট ভরানো, যাতে পাঞ্চ কম খরচ হয়। তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, যত খুশি গেলাস ভর্তি ক'রে খাবে। নইলে আর ফুর্তি কী? যত সব—।' আমরা বিনা দ্বিধায় এডওয়ার্ডের সদুপদেশের সদ্ব্যবহার করলাম।

তাত্য়ানা দিব্যি দিয়ে ব'লে গেলো আমার জিনিসপত্র গোছানো হয়ে গেলেই প্যারিসে চ'লে আসতে। ও আগেই লিখে রেখেছে ওর মাকে, প্রতিবেশীরা অপেক্ষা ক'রে আছে আগ্রহ নিয়ে। পরীক্ষার পরই তাত্য়ানার সঙ্গে কেন চ'লে আসছি না, জানতে চেয়েছেন মাদাম আন্তনভ। তাত্য়ানা মাকে বুঝিয়েছে, ভারতবর্ষে ফিরে যাবে, কিছু প্যাকিং অন্ততঃ ক'রে আসতে হবে তো।

'আমাদের বাড়ি অবশ্য যাচ্ছেতাই, তোমাকে আরামে মোটেও রাখতে পারবো না। না জানি তুমি কী ভাববে। তুমি ভারতীয়, দারিদ্র্য অনেক দেখেছো, সে ভেবেই অনেক সাহস ক'রে নেমন্তন্ন করছি। আমাদের অবস্থা দেখে হেসো না কিন্তু।'

আমি হেসে বললাম, 'তাত্য়ানা, বিনা খরচায় প্যারিসে থাকতে পারলে লোকে কী কষ্ট না সহ্য করতে রাজি হয়। তুমি না ডাকলে আমি প্যারিসে আর যেতামও না। এখন সুযোগ দিচ্ছো, ছাড়বো না। আমি কার্পেটে শুতে পেলেই সন্তুষ্ট।'

'না না, একটা বিছানা তুমি পাবে। তবে খিদে পাবে তোমার। অর্ধভুক্ত থাকবে। আমাদের বাড়িতে রান্নার পাট বিশেষ নেই। আমরা সব অনাহারী! আমি কিছু মশলা নিয়ে যাচ্ছি। তুমি এসে ভালো-ভালাই তোমাদের হলদে-লাল ঝোল রান্নাবান্না কোরো।'

হাসিমুখে বিদায় নিলাম আমরা।

[১] এই ঝুলন্ত হলুদ ফুল ল্যাবার্নামের মঞ্জরী না হয়ে যায় না। আমার বর্তমান বাড়িতে পিছনের বাগানের ঠিক মাঝখানে একটি ল্যাবার্নাম গাছ থাকায় পরবর্তী কালে এই গাছ আর তার ফুল নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছি। [২০০৫]

[২] ঐ সময়ে লেখা আমার একটি কবিতায় এই বিশেষ নাসপাতি গাছটির কথা বলা হয়েছে। বসন্তে গুচ্ছ গুচ্ছ সাদা ফুল ফুটলে গাছটি স্বর্গীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠতো। কবিতাটির নাম 'মে মাসের গান', আমার দ্বিতীয় কবিতার বই *সবীজ পৃথিবী*-তে সংকলিত। [২০০৫]

তিন

এর আগে প্যারিসে আমি কখনো রাত কাটাই নি। সুইটজ়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের সময় একবার যাবার পথে আর একবার ফেরার পথে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মার্কিনী কায়দায় সফর করেছিলাম। আমার সঙ্গে যে-ভারতীয় মেয়েটি[১] ছিলো সে আগে প্যারিস ঘুরে গেছে। সে ঐ ফাঁকেই আমাকে লুভ্‌র্‌, ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের গ্যালারি, শাঁজ়েলিজ়ে, বোয়া দ্য বুলনের বাইরের দিক, তুর্‌ ইফেল বা আইফিল টাওয়ার, এবং প্লাস্‌ দ্য লা কঁকর্দ দেখিয়ে দিয়েছিলো। আমি ক্ষণে ক্ষণেই পুলকিত বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে সফরের গতি ব্যাহত ক'রে দিচ্ছিলাম। স্পষ্ট মনে আছে, খুব দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে একটি রাস্তার হু'-পাশে বাড়িগুলির বৈশিষ্ট্য আমাকে আকর্ষণ করছিলো, হঠাৎ চোখে পড়লো রাস্তার নাম—রু স্যাঁত্‌ অনরে। আমি অভিভূত হয়ে ব'লে উঠলাম, 'আমরা রু স্যাঁত্‌ অনরে দিয়ে হাঁটছি !' আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার সঙ্গিনী আমার এই ব্যাকুলতায় বিব্রত বোধ করতে লাগলো—আমি এরকম করতে থাকলে আসল দ্রষ্টব্যগুলোই দেখা হবে না। কিন্তু যে-রু স্যাঁত্‌ অনরের নাম মন্ত্রের মতো এতবার শুনেছি, এতবার বইয়ের পাতায় দেখেছি, তার বুকের উপর দাঁড়িয়ে এক মিনিটও কি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করবো না ?

এবারও প্যারিস গেলাম চেনা পথে : স্কাইওয়েজ় এয়ার-কোচ লণ্ডন-প্যারিস। সব থেকে সস্তা পড়ে। কিন্তু প্রচণ্ড হয়রানি। বাসেই যাত্রা আগাগোড়া, শুধু মৌমাছির মতো ছোট্ট একটি প্লেন এসে সমুদ্র পার করিয়ে দেয়। বেলা বারোটা নাগাদ পৌঁছলাম প্লাস্‌ দ্য লা রেপুব্‌লিকে, স্কাইওয়েজ়ের টার্মিনালে। তাত্‌য়ানা হাজির, দারুণ খুশী আমাকে দেখে। প্রথমে আমরা সংলগ্ন উন্মুক্ত ক্যাফেতে কফি খেলাম, আমি গরম গরম, আর তাত্‌য়ানা যথারীতি গরম কাপকে নাতিশীতোষ্ণ ক'রে। নাঃ, ওকে আর কফিপানে অভিজাত করা গেলো না। তার পর বাড়ি। তাত্‌য়ানা প্যারিস শহরের উপরে থাকতো না, থাকতো প্যারিসের উপকণ্ঠবর্তী এক শহরে, নাম ম্যদঁ। প্যারিসের শহরতলি-অঞ্চল। মেট্রো অর্থাৎ মাটির নীচের রেলপথে মেয়রী দিসি পর্যন্ত, সেখান থেকে বাস। নামতে হতো যে-স্টপে তার নাম শর্ম্যাঁ দে ভিন্‌, অর্থাৎ দ্রাক্ষাবীথি। দ্রাক্ষাকুঞ্জের চিহ্নমাত্র আজ আর নেই, আছে শহরতলির শুকনো শক্ত রাস্তা। কিন্তু একসময় আঙুর আর মদের জন্য বিখ্যাত ছিলো এই অঞ্চল।

বাস থেকে নেমেই বুঝলাম ম্যদঁ একটু উঁচু জমির উপর, নীচে গোটা প্যারিস শহরটা দেখা যাচ্ছে। আইফিল টাওয়ার এবং সেইন নদীর উপরকার সাঁকোগুলি সহজেই নজরে পড়ে। কিছু দূর অগ্রসর হয়েই তাত্‌য়ানা একটা গলির ভিতর দিয়ে শর্টকাট নিয়ে নিলো।

গলিটা দেখে অবাক হলাম। এদিক ওদিক পুরোনো কাগজ, কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো, সিগারেটের প্যাকেট প'ড়ে আছে। বৃষ্টিতে সেগুলি এবড়োখেবড়ো কাদামাটি আর পাথরের সঙ্গে লেপ্টে আছে। বুঝলাম এ গলিটাতে কোনো দিন ঝাঁট পড়ে না। যে যেখানে কাগজ ফেলেছে সেটা সেখানেই শুয়ে আছে শিলীভবন বা দ্রবীভবনের অপেক্ষায় অনন্ত শয্যায়। দেশ ছাড়বার পর এই প্রথম এ ধরণের রাস্তা চোখে পড়লো। গলির পরেই অবশ্য আবার পরিচ্ছন্ন রাস্তা, গলিটা সত্যিই নিয়মের ব্যতিক্রম। ডান হাত বাঁ হাত কয়েকবার মোড় নিয়ে অবশেষে তাত্‌য়ানা আমাকে যে-দরজার সামনে এনে দাঁড় করালো, সেটা যে কোনো গৃহস্থবাড়ির সম্মুখভাগ তা ভাবতে পারি নি। দেখতে খানিকটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ির গ্যারাজের মতো। কাঠের উপর আধময়লা কালো-রঙ-করা। ঢুকবার আগে তাত্‌য়ানা সাবধান ক'রে দিলো, 'হেসো না কিন্তু, এটাই আমাদের বাড়ি। জানি বাড়ি বলা চলে না একে।' আমি ওকে নিশ্চিন্ত হতে ব'লে উঠানে ঢুকে পড়লাম। বাঁ দিকে তালা-বন্ধ একটি দরজা, ডান দিকে টিনের বেড়া, আগাছা, দড়িতে ঝুলছে কাচা কাপড়; এক পাশে ছাউনি-দেওয়া একটা আটচালা, সেখানে একটা বিরাট পরিত্যক্ত ধূলিধূসরিত মোটরগাড়ি।

একরাশ মিষ্টি হাসি মুখে নিয়ে ছুটে এলেন মাদাম আন্তনভ। ছোটখাট গড়ন, বয়স সত্ত্বেও মুখে একটা মন-ভোলানো লাবণ্যের ছাপ। হাসিটি খাঁটি এবং সরল। দেখেই বোঝা যায় তাত্‌য়ানার মা, আকারে-প্রকারে এক। শুধু একজনের শরীরে, চোখের নীচে, কপালে পড়েছে প্রৌঢ়ত্বের অঙ্গুলিস্পর্শ। মেয়ে এখনও তন্বী, মা সে-অনুপাতে একটু মোটা হয়ে পড়েছেন। 'আঁশাঁতে, আঁশাঁতে,' অর্থাৎ 'তোমাকে দেখে মুগ্ধ হলাম।'

বাড়িতে ঢুকতেই একটি জীর্ণ ঘরে একটি ঝকঝকে নতুন জলের বেসিন এবং ঝর্ণা-বসানো বাথটব। টেবিলের নীচে গ্যাসের সিলিণ্ডার রয়েছে, তার সাহায্যে জল গরম হচ্ছে। বুঝলাম, এ বাড়িতে আগে আদৌ এ-সব ছিলো না, ওঁরাই কোনোমতে ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছেন। তার পরের ঘরে একটি টেবিল পাতা, কয়েকটি বিশুষ্ক চেয়ার, দেয়ালের গায়ে ধূলিমলিন তাকে অজস্র রুশ বই, আরমানী পোশাকে কিশোরী তাত্‌য়ানার একটি বাঁধানো ফোটো, কাচের আলমারিতে কিছু বাসনপত্র সাজানো। তার পরে আরও একটি ঘর, এখানে বিগত শতাব্দীর একটি জরাগ্রস্ত সোফা, একটি অর্ধমৃত পিয়ানো, এবং একটি ঝকঝকে টেলিফোন। দেয়ালে তাত্‌য়ানা আর তার দুই ভাইয়ের একত্র তোলা বাল্যকালীন ছবি, জায়গায় জায়গায় নষ্ট হয়ে গেছে। এর পর একটি ঘেরা বারান্দার মতো, একদিকে উঠে গেছে দোতলায় যাবার ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি, অন্যদিকে রান্নাঘরের দরজা।

রান্নাঘরটি ছোট, কিন্তু তারই মধ্যে পরিচ্ছন্ন। একটি দু'-মুখওয়ালা বিজলী উনুন, বেসিনের কলে শুধু ঠাণ্ডা জল। জানলার তাকে দুটি ইয়া বড় বড় টোমাটো রোদ পোহাচ্ছে, টোমাটোদের পাশে ঘুমোচ্ছে একটি পুষ্ট বিড়াল। রান্নাঘরের পাশে মাদাম আন্তনভের শোবার ঘর, সেখানে বাঁধা রয়েছে জ্বিজ্বি আর বুদা কুকুরদ্বয়। তারা আমাকে দেখে অত্যন্ত উৎসাহভরে

স্বাগত জানাতে লাগলো। কিংবা ভৌ-ভৌ রবে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, 'কে তুমি, কেন এসেছো ?' মাদামের বিছানার চাদর তাদের চ্যুত লোমে সমাচ্ছন্ন, সারা ঘরে একটা কুকুর-কুকুর গন্ধ। এক পাশে একটা রেডিও, একটা ড্রেসিং-টেবিলের উপর কয়েকটি ম্লান পারিবারিক ফোটো—তাঁর ছেলেমেয়েদের। তা ছাড়া চিরুনি, এসেন্সের শিশি, চিঠির কাগজপত্র। কুলুঙ্গিতে খৃষ্টমূর্তি, তার সামনে ঝুলন্ত শুকনো মালা, দেয়ালে মার্কামারা ক্যালেণ্ডার, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জামাকাপড় ও পত্রপত্রিকা। এক কোণে কাপড়চোপড়ের আলমারি। নড়বড়ে একটা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে পিছনের উঠান—একেবারে *পথের পাঁচালী*-র অপু-দুর্গার উঠানের মতো। বৃষ্টিম্লান ভাঙা বেঞ্চি, অজস্র আগাছা, ছেঁড়া অয়েলক্লথের মাদুর, অযত্নবর্ধিত ঘাস। তারই ফাঁকে দু'-একটি গ্যাঁদা-জাতীয় ফুল, উপুড়-করা টবে ঢাকা শিশু চারা। একটি রোদবৃষ্টির আশীর্বাদে ভরা টেবিলও রয়েছে লক্ষ্য করলাম; বলাই বাহুল্য, তার আর পালিশ ব'লে কিছুই অবশিষ্ট নেই।

'চলো, তোমাকে তোমার ঘরে নিয়ে যাই,' বলে তাত্‌য়ানা। ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে আমরা পৌঁছই 'দোতলা'য়। আসলে এ হলো অ্যাটিক বা চিলেকোঠা। 'এটা হলো আমার ঘর, তুমি এখানে থাকবে।'

বুঝতে পারলাম, কোনোমতে কাজ সারার উদ্দেশ্যেই এই ঘর ব্যবহৃত হয়। মূর্তিমতী শ্রীহীনতা বিরাজ করছে। মলিন দারিদ্র্য শতহস্তে তার ছাপ রেখেছে। বিরাট বিরাট জানলার কাচ-ভাঙা শার্সি, খুলে-পড়া কাঠের পাল্লা, পর্দার বালাই নেই। দেয়ালের চুন-বালি খ'সে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় লোনা ধ'রে বড় বড় দাগ হয়ে আছে, প্রাচীন কাগজ ঝুলে আছে কোনো কোনো কোণায়। গতসৌষ্ঠব মেঝে। এরই মধ্যে জীবনধারণের সরঞ্জাম অপরিচ্ছন্নভাবে বিক্ষিপ্ত। একটি পুরোনো ড্রেসিং-টেবিল, একটি স্প্রিং-এর খাট, একটি আধুনিক টেবিল, আরেকটি লেখার ডেস্ক, দেয়ালের গা ঘেঁষে বইয়ের তাক, তা ছাড়া কুলুঙ্গি-বোঝাই বই। টেবিলবাতির নীচে রাশ রাশ চিঠি, সুদৃশ্য চিঠি লেখার কাগজ, রুশ ও ফরাসী কাব্যগ্রন্থ, ক্ল্যাসিকাল আর্টের দুর্মূল্য সচিত্র গ্রন্থ, অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি-বিষয়ক অসংখ্য পত্রিকা, গ্রাফপেপার, ফাইল। বিছানার উপর একটি নীল-রূপালী রঙের ট্র্যানজিস্টার, তাত্‌য়ানার কোনো এক নীরব ভক্তের প্রীতি-উপহার। একটি ভাঙা বেতের চেয়ারের উপর সাদা পশমের ছোট গালিচা, তার উপর তাত্‌য়ানার সদ্যঃক্রীত টেলেফুংকেন রেকর্ডপ্লেয়ার। মেঝের উপর কার্ডবোর্ডের বাক্সে রেকর্ড : বাখের *ব্র্যাণ্ডেনবুর্গ কন্‌চের্টো*, ভিভাল্‌দির *দ্য ফোর সীজ়ন্‌স্*, স্পেনীয় গিটারের একটি নতুন-বার-হওয়া রেকর্ড (তাত্‌য়ানার কোনো এক ছাত্রের উপদেশ-অনুসারে কেনা), মুসর্গস্কির অপেরা *বরিস গদুনভ* তিন খণ্ডে, স্ত্রাভিন্‌স্কির ব্যালে *পেত্রুশ্‌কা—স্বয়ং স্ত্রাভিন্‌স্কি-কর্তৃক পরিচালিত*, আর অজস্র আটাত্তর স্পীডের রুশ লোকসংগীত,—এগুলি মস্কোয় কেনা। বিছানার শিয়রে একটি বহুবর্ষম্লান ফোটোগ্রাফ—একটি স্মিতমুখ লাবণ্যময়ী কিশোরীর। না, তাত্‌য়ানার নয়, তার মায়ের, এবং মাদাম

আন্তনভরূপে নয়, সপ্তদশী আরমানী সুন্দরী আরাক্সী নার্সিসিয়েন হিসাবে। আশ্চর্য, চেনা যায় এক নজরেই। একই মুখ, এখন শুধু প্রৌঢ়ত্বের কিছু অবশ্যম্ভাবী চিহ্ন পড়েছে। হাসিটুকু আছে অপরিবর্তিত। কালের গ্রাস থেকে স্নেহময়ী মায়ের মুমূর্ষু ছবিটিকে সযত্নে রক্ষা করেছে পিতৃপরিত্যক্তা কন্যা।

ঘরের এক কোণে একটি জিনিস নজরে পড়লো। কাঠের একটি হেলানো বোর্ড। তার গায়ে পিন দিয়ে আটকানো গোটা পঞ্চাশেক ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড—পারসীক আর ভারতীয় 'মিনিয়েচর' চিত্রকলার নিদর্শন। চোখে পড়লো পাখী-হাতে সুলতানাদের পরিচিত ভঙ্গি, ফার্সী হরফে লেখা উদ্ধৃতি। তাত্য়ানার জীবনের আফগান পর্যায়ের উত্তরাধিকার।

মাদাম আন্তনভ নীচে থেকে তাড়া দিলেন। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে দুপুরের খাওয়ার জন্য তৈরি হলাম। প্রথম দিন অতিথি-আপ্যায়নের জন্য সাধ্যমতো আয়োজন করেছেন ভদ্রমহিলা। টক বাঁধাকপির স্যূপ, মাংস, নিপুণ হস্তে প্রস্তুত একরাশ স্যালাড। আমি রওনা হয়েছি সেই কোন্ ভোরে, আমার সবই অমৃতের মতো মনে হতে লাগলো। মাদাম বারবারই আয়োজনের স্বল্পতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলেন, আমি প্রতিবাদ করতে থাকলাম। হঠাৎ তাত্য়ানার খেয়াল হলো: 'সে কি, প্যারিসে এসেছে, আসল জিনিসই তো দেওয়া হয় নি!' দ্রুত উঠে গিয়ে একটা বড় কাল্‌চে-সবুজ রঙের বোতল নিয়ে এলো। ঢক্ ঢক্ শব্দে গেলাসে ঢাললো। স্পর্শ ক'রে মনে হলো এর থেকে ভালো লাল দ্রাক্ষানির্যাস আমি ইংলণ্ডে পান করেছি। বোতলটার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, দেখলাম সেটা লেবেলহীন। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তাত্য়ানা, এ কোন্ কোম্পানি?'

তাত্য়ানা হেসে বললো, 'আর বোলো না, এই তো সামনের আরমানী দোকানের মাল। খুবই সাধারণ, এ কিছুই না, কিছুই না। এ গরিবখানার অভ্যর্থনা।'

আমি বললাম, 'আমি অত সমঝদার নই। আমার সাধারণ জিনিসেই পরিতৃপ্তি। তবে খুচরো কী ক'রে কিনলে?'

'এ দোকানে খুচরো পাওয়া যায়। ঢেলে দেয়।'

'দেখো বাবা, সন্দেহজনক। কেরোসিনের বোতল মনে হচ্ছে!'

সশব্দে হেসে ওঠেন দুজনেই—'না না, ভেবো না। পরিষ্কার। আমাদেরই পুরোনো বোতল।'

হঠাৎ মাদাম আন্তনভ ভুরু তুলে প্রশ্ন করেন, 'ওকে সেটা দেবে নাকি?'

'হ্যাঁ মা, দিতে পারো। ওর বোধ হয় ভালোই লাগবে। ওর খুব পছন্দ ও ধরণের জিনিস। মশলা দেওয়া তো।'

তাত্য়ানা উঠে গেলো এবং কাগজে মোড়ানো কী যেন নিয়ে এলো। জিনিসটা কী ভাবছিলাম। সংরক্ষিত মাংস। সসেজ বা সালামি নয় কিন্তু। মাংসের আমসত্ত্ব বললে বোধ হয় খানিকটা বর্ণনা দেওয়া হয়। মশলার সুগন্ধ বেরোচ্ছে।

'সামনের আরমানী দোকানের,' বলে তাত্য়ানা, 'খাও, কিচ্ছু হবে না!' খেয়ে দেখলাম, সত্যিই অপূর্ব।

খাওয়া শেষ হলো বড় বড় রসাল পীচ দিয়ে। জোর ক'রে তিন-তিনটে পীচ খাওয়ালেন মাদাম আন্তনভ। আমাদের গ্রীষ্মে আমের যে-স্থান, ফ্রান্সের গ্রীষ্মে পীচের সেই স্থান। এত বড়, এত রসাল পীচ ইংলণ্ডে কখনো দেখি নি।

'বঁ, বঁ, পীচ ইজ্ গুদ্ ফর ইউ,' বলেন মাদাম একগাল হেসে। রুশ আরমানী ফরাসী—তিন ভাষাতেই তিনি সুদক্ষ। ইংরেজীও বলেন বেশ সুন্দর। জার্মান একটু একটু। মা-মেয়ের কথাবার্তা চলে রুশে। তাত্য়ানা আরমানী ভাষা বোঝে, কিন্তু বলতে পারে না।

খাবার বাসন প্রথম দিন মাদাম নিজেই মাজলেন। আমি সাহায্য করবার জন্য প্রার্থনা জানালেও আমাকে ছুঁতে দিলেন না। এমন সময় হৈহৈ করতে করতে প্রবেশ করলেন মাদামের ছোট ভাই। সঙ্গে মাদামের অশীতিবর্ষীয়া মা, মাদাম নার্সিসিয়েন—

'কী রে আরাক্স, তোর অতিথি কই? ভারতীয় মেয়ে কোথায়?'

নতদেহ বৃদ্ধা আমার দিকে এগিয়ে এলেন। গায়ে কালো পোশাক, ছোট ছোট ঝিনুকের চিরুনি দিয়ে সাজানো সুবিন্যস্ত পর্যাপ্ত রৌপ্যশুভ্র কেশরাশি। কুঁচকানো চামড়ার মধ্যে থেকে উঁকি মারছে স্বচ্ছ নীল চোখ। আমার গায়ে পিঠে সস্নেহে হাত বোলাতে লাগলেন।

'তাত্য়ানার চেয়ে অনেক ছোট,' বলেন মৃদু হেসে। মাদাম নার্সিসিয়েন মাদাম আন্তনভের চাইতেও ভালো ইংরেজী বলেন। শুদ্ধ ইংরেজীতে ধীরে ধীরে বলতে থাকেন—

'তোমাদের দেশের সঙ্গে আমাদের যোগ আছে। আরমানীরাও প্রাচ্য। ভাষার দিক থেকে একই ইন্দো-ইয়োরোপীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত আমরা। তা ছাড়া, পারিবারিক জীবন, মূল্যবোধ, পাপপুণ্যজ্ঞান, এ-সব ক্ষেত্রেও তোমাদের সঙ্গে আমাদের মিল আছে। তোমাদের দেশের দুজন পুরুষকে আমি খুব শ্রদ্ধা করি : তাগোরে আর গান্দী। গান্দী ছিলেন একজন সন্ত, এক মহাপুরুষ। বিশ শতকের রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় তাঁর অবদান যে কত মহৎ তা ইয়োরোপে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম। আর তাগোরে, আমি অবশ্য মাত্র অনুবাদেই পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যেই বুঝতে পেরেছি, কী শক্তি আর কী সৌন্দর্য তাঁর কবিতাতে। আমাদের আজ সৌভাগ্য যে তাঁদের দেশের একজন আমাদের বাড়িতে অতিথি।'

'দিদিমা,' ব'লে ওঠে তাত্য়ানা, 'তাগোরে যে-ভাষাতে লিখেছিলেন, কেতকীরও সেই ভাষা। আর কেতকীও সেই ভাষাতে কবিতা লেখে, জানো! ছাপায়, কাগজে বার হয় রীতিমতো!'

তাত্য়ানার কাণ্ডে আমি লজ্জিত বিব্রত মুখ করতে থাকি। মা দিদিমা দুজনেই 'ঁ ঁ' ক'রে ওঠেন। 'হাউ ওয়াণ্ডারফুল!' বলেন ছোটমামা। ইনিও নির্ভুল ইংরেজী বলেন।

মা, মেয়ে, আর মামা সিগারেট ধরান। তাত্‌য়ানা নিয়মিত ধূমপায়ী নয়, তবে পাল্লায় প'ড়ে দু'-একটা খায়। গম্ভীর হয়ে যান দিদিমা। বলেন, 'কী যে ছাইভস্ম খাও তোমরা। আরাক্স তো কথাই শোনে না। আশি বছর বয়সে কি আমার মতো ভালো স্বাস্থ্য থাকবে? তাত্‌য়ানা, তুইও ধরেছিস। অত্যন্ত বদভ্যেস। স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। তুমি খাও না তো, কেতকী? ভারতীয় মেয়েরা আশা করি ধরে নি এখনও? শুরু করাটাই খারাপ।'

ব্যাকুল মুখে বৃদ্ধা তাকান আমার দিকে। 'না না, আমি খাই না,' সান্ত্বনা দিই তাঁকে। স্বাদ কিরকম জানবার জন্য পরম কৌতূহলবশতঃ দু'-একবার টান যে দিয়েছি, বা ভারতীয় মেয়েরা যে কেউ কেউ ধরেছেন আজকাল, তা আর জানালাম না তাঁকে।

'কেতকীকে তেরোই জুলাইয়ের প্যারিস দেখাতে নিয়ে যাবি না?' ব'লে ওঠেন মঁসিয়ে নার্সিসিয়েন। হঠাৎ আমাদের মনে পড়ে—সত্যিই তো। বাস্তিলদিবসের আগের সন্ধ্যা দেখবার জন্যই তো তেরো তারিখের সকালে রওনা হয়েছি।

'তবে তোরা তৈরি হ'। আমরা আসি'—বলেন মাদাম নার্সিসিয়েন। 'আবার আসবো, আবার আসবো' ব'লে সশব্দে বিদায় নেন মঁসিয়ে নার্সিসিয়েন। বুঝলাম বেশ রসিক লোক তিনি।

বেরোবার আগে একটু বিশ্রাম ক'রে নেই আমরা। বিকেল ছ'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ি। শম্যাঁ দে ভিন্ বাসস্টপ থেকে মেয়রী দিসি। সেখান থেকে শহরের অভ্যন্তরে। কার্তিয়ের-লাত্যাঁয় পৌঁছতে পৌঁছতে পৌনে সাতটা বাজে। শহরতলির বাসে সবাই আমাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু শহরে অতটা নয়। ছাত্রক্যান্টিনে সান্ধ্যভোজন সারতে চায় তাত্‌য়ানা। কিন্তু—

'তোমার অবশ্য টিকিট নেই।'

'কেন, এখন কেটে নিলে হয় না?'

'এখন কাটা যায় না। কাউন্টার রাত্রে বন্ধ থাকে। টিকিট সকালে কেটে রাখতে হয়।'

'তবে কী হবে?'

'চলোই না, দেখা যাক।'

অগণিত ছাত্রছাত্রীর মিছিলে যোগ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ক্যান্টিনের দোতলার হল-ঘরে উঠতে থাকি আমরা। তাত্‌য়ানার হাতে টিকিট আর তার ছাত্র-কার্ড। আন্তর্জাতিক আইন-বিষয়ে আরও একটা ডিপ্লোমা পরীক্ষা দেবে সে, সুতরাং এখনও অংশতঃ ছাত্রী। আমার হাতে আমার আন্তর্জাতিক ছাত্র-পরিচয়পত্র।

সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে আছে চশমাধারী গুটি-দুই ছাত্র-পাণ্ডা। তাত্‌য়ানা তাদের একজনকে বিনীতভাবে বলে, 'আমার বন্ধুর জন্য একটা টিকিট কাটবো। খুব দুঃখিত। আগে সম্ভব হয় নি কেটে রাখা।'

ছাত্র-নেতা ঈষৎ গুঞ্জন করে। তাত্য়ানা মিনতি করে। ছেলেটি বলে, 'আপনি বলছেন বটে। জানি, কারও ক্ষতি নেই কোনো। কিন্তু সবাই যদি এ কথা বলে তবে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চলবে কী ক'রে ? আচ্ছা, দিন, দেখি, কোথায় কার্ড ?'

আমার আন্তর্জাতিক ছাত্র-কার্ডটি মনোযোগ দিয়ে দ্যাখে সে, চকিতে আমার মুখের সঙ্গে মিলিয়ে নেয় ফোটোগ্রাফ। তার পর ঈষৎ হেসে টিকিট দেয়। বলে, 'এইবার পালান। এর পর থেকে মনে ক'রে সকালে কেটে রাখবেন !'[২]

'তুমি বিদেশী দেখেই দিলে,' বলে তাত্য়ানা, 'শাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে তো !'

বিশাল সুদৃশ্য পরিচ্ছন্ন ক্যান্টিনের দোতলার ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। মুগ্ধ হলাম ছাত্রদের খাবারের ব্যবস্থা দেখে। স্থানীয় ছাত্রদের দিতে হয় মোটে এক ফ্রাংক, অর্থাৎ এক টাকা, বাইরের টুরিস্ট ছাত্রদের (আমার মতো) তিন। বাকি খরচ ফরাসী সরকার বহন করেন। ছাত্রদের পুষ্টির জন্য উপযুক্ত পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহজাতীয় পদার্থ, এবং খাদ্যপ্রাণ-সম্বলিত সুষম খাবার দেওয়া হয়ে থাকে। ভাত বা ডাল বা স্প্যাগেটি, মাংসের স্টেক এবং আলুভাজা, এ ছাড়া আরও একটি তরকারি, তাজা স্যালাড, দই বা পনীর, একটি টাটকা ফল। শুক্রবার মাংসের বদলে মাছ। ট্রে, কাঁটা-চামচ-ছুরি, নুনদানী, গেলাস, টেবিল, মেঝে— সবই ঝকঝক করছে, কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। কাউন্টার থেকে খাবারে বোঝাই ট্রে নিয়ে ছাত্ররা আসছে, যে-কোনো একটা টেবিলে খেয়ে নিয়ে অন্য এক কাউন্টারে ধোবার জন্য এঁটো বাসন ফেরত দিয়ে যাচ্ছে। শ'য়ে শ'য়ে ছেলেমেয়ে আসছে-যাচ্ছে, দ্রুতগতিতে হচ্ছে কাজ, ঝনাৎ ঝনাৎ জড়ো হচ্ছে সদ্য-ধোয়া উজ্জ্বল বাসনপত্র। এরা এত বেশী বেশী ক'রে খাবার দেয় যে খেয়ে কূল করা যায় না। বোতলে দুধ, বীয়র বা কোকাকোলা আলাদা পয়সা দিয়ে কেনা যায়। চতুর্দিকে অগণিত যুবকযুবতীর গুঞ্জন। বহু আরবী ছাত্র চোখে পড়লো। আর ইন্দোচীনের ছাত্রও প্রচুর। আমার দিকে ফিরে তাকালো আহারে ব্যস্ত ছাত্রসম্প্রদায়। 'শাড়ির একটা প্রেস্টিজ আছে তো।'

আমার নিমেষের মধ্যে মনে পড়লো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীন ছাত্রসংঘ-পরিচালিত' ক্যান্টিন—তার ম্লান দেয়াল, অপরিচ্ছন্ন মেঝে, কটু তেলের দুর্গন্ধ, নোংরা বাসনপত্র, সর্বোপরি বালখিল্য পরিচারকবৃন্দ-কর্তৃক পরিবেশিত জীবাণুসংকুল পুষ্টিহীন শ্রীহীন আহার্য। প্যারিসের অনুরূপ উচ্চমানের ছাত্র-ক্যান্টিন আমাদের দেশে কবে হবে সে-কথা ভেবে গলা আটকে এলো। দুস্তর ব্যবধান। আমাদের ছাত্ররা যেখানে কৃষ্ণনখ পরিচারকদের হাতের বাসি পচা নাড়ীভুঁড়ির পিণ্ডকে প্রচুর লঙ্কাবাটার সঙ্গে গলাধঃকরণ ক'রে 'চপ' খাওয়ার সাধ মেটাচ্ছে, সেখানে প্যারিসের ক্যান্টিনে হাসপাতালের নার্সের মতো পরিচ্ছন্ন পরিচারিকারা শ্রীহস্তে অন্ন পরিবেশন করছে। সর্ষের সস্‌টি পর্যন্ত একেবারে টাটকা, এইমাত্র তৈরি হয়ে এলো।

ডিনারের পর তাত্য়ানা আমাকে নিয়ে একটি উন্মুক্ত ক্যাফেতে বসলো। 'কী খবর, তাত্য়ানা,' ব'লে এগিয়ে এলো একদল ছেলে। একটি ছেলে আমার সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময়ের পর আমার কাছে এক ফ্রাংক ভিক্ষা করলো। সারা দিন নাকি সে খায় নি। হেসে উঠলো অন্যেরা : 'ওর কথায় কান দেবেন না, ওর মাথায় ছিট আছে, সবাইকে অমন বলে।'

'ওদের কথা শুনবেন না, আমার মাথা ঠিকই আছে,' বিড়বিড় করে পাগলাটে ছাত্র, 'নেহরু কেমন আছেন? আহা, ভারতবর্ষের মেয়ে, কী সুন্দর ইংরেজী বলে! আমি মুগ্ধ হলাম! আমিও ভালোই বলি, তাই না?'

আমি ওকে আশ্বাস দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু অন্যেরা 'চল্ চল্, অনেক হয়েছে' ব'লে সশব্দে হেসে টেনে নিয়ে গেলো ওকে। কী জানি, নেশা করেছে বোধ হয়।

সোনালী ফ্রেমের চশমা-পরা ছিপছিপে একজন বছর-ত্রিশেকের যুবক এগিয়ে আসে। 'জ়াক, তুমি এখানে—', চমকে ওঠে তাত্য়ানা, 'এই যে আমার ভারতীয় বন্ধু।'

'বুঝতে পেরেছি। স্বাগত! মুগ্ধ হলাম! আরেক কাপ কফি হোক।'

গম্ভীর প্রকৃতির ছেলেটি। নানান বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে। এদিকে উৎসব উপলক্ষ্যে দলে দলে বেরিয়েছে সুসজ্জিত নরনারী। ঠিক কিভাবে আমাকে প্যারিসে ঘোরালে আমার তেরোই জুলাই সার্থক হবে, তা নিয়ে মতভেদ হয় তাত্য়ানা-জ়াকের। একজন বলে অমুক অঞ্চল, আরেকজন বলে অমুক। প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডার পর ঠিক হয় জ়াক তার গাড়িতে আমাদের নিয়ে সারা প্যারিসই চক্কর দেবার চেষ্টা করবে।

অনতিদূরে জ়াকের গাড়ি পার্ক-করা। 'ওঠো,' বলে তাত্য়ানা, 'এ হলো আমাদের জাতীয় গাড়ি, দ্যশভো। দেখতে ছোট্টটি এবং মজার, কিন্তু দারুণ শক্ত এঞ্জিন। এর নামই গাড়ি। আমি এরকম একটা কিনবো।'

জ়াকের দ্যশভো গাড়িতে প্যারিসের পথে পথে প্রাক্-বাস্তিল সন্ধ্যা উদ্‌যাপন আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। ঐ দিন ফরাসী গাড়ির তথা চালকদের হাবভাব এবং কায়দাকানুন এমন এক জিনিস যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া উপলব্ধি করা যায় না।

রাত যতই বাড়তে লাগলো ততই বেগে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগলো জ়াকের গাড়ি এবং অন্যান্য সহস্র সহস্র স্বয়ংচলচ্ছকট। সামাল সামাল তরণী। যেন জোয়ার এলো প্যারিসের রাস্তায়। প্রাণবন্যায়, স্ফূর্তির নেশায়, চঞ্চলতায় উদ্দাম হয়ে উঠলো পদচারী গাড়িধারী উভয় দলই। প্লাবনের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো ট্র্যাফিকের আইনকানুন। কর্মব্যস্ত পিঁপড়েদের মিছিলে যদি অশান্তি আনা যায়, তবে তারা যেমন ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে, অসংখ্য সশব্দ গাড়ি তেমনভাবেই প্রবল বেগে সর্বত্র সঞ্চালিত হতে লাগলো।

ঘর ছেড়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছে পথে, বাঁধনহারা ছন্নছাড়ার মতো। বাহুবদ্ধ হয়ে দলে দলে চলেছে কেউ কেউ। অজস্র গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে এঁকে-বেঁকে জনতার স্রোতও

সমানে বয়ে চলেছে। গাড়িরা এক কথায় দিশাহারা পাগলপারা, তাদের ডান-বাঁ ভেদাভেদ লুপ্ত। চতুর্দিক থেকে চতুর্দিকের উদ্দেশ্যে চলেছে তারা, ধাক্কা খেতে খেতে খাচ্ছে না, উল্টে যেতে যেতে যাচ্ছে না, লোক চাপা দিতে দিতে দিচ্ছে না। খুশিতে ভরপুর জনতার এক তিল ভয় নেই, সশব্দে গাড়ির গায়ে থাপ্পড় মেরে অবিশ্বাস্যভাবে পথ ক'রে নিচ্ছে।

আমি এক দিকে সব অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করছি, অন্য দিকে প্রাণের জন্য জপছি হরিনাম। ভগবান ভগবান, দুর্ধর্ষ ফরাসী চালকের খেল থেকে এবারের মতো প্রাণটা নিয়ে যেন নিষ্কৃতি পাই। প্যারিসে এসে শেষে কি বেঘোরে প্রথম রজনীতেই দুর্ঘটনায় প্রাণটা দিতে হবে ? দু'ধারে যত বাতি আর ফোয়ারা ঝলসে উঠলো। আলোকসজ্জিতা নগরী উল্কার মতো গাড়ির জানলার পাশ দিয়ে খ'সে যেতে লাগলো।

চতুর্দিকে উঠছে ভেঁপুর নিনাদ। সারা বছর ভেঁপু না বাজাতে পারার আফসোস, আজ যেন সুদে-আসলে চালকেরা উশুল ক'রে নিচ্ছে তাদের পাওনা। কানে তালা লাগবার উপক্রম। খেয়াল করলাম ভেঁপু মারফৎ একটা বিশেষ আওয়াজ দেওয়া হচ্ছে। প্যাঁ প্যাঁ প্যাঁ—প্যাঁপ্ প্যাঁ। তাত্য়ানা বললো, ওটার মানে হচ্ছে 'আলজ়েরী ফ্রাঁসেজ়', অর্থাৎ আলজেরিয়া ফ্রান্সের। অবাক হলাম ভেবে যে স্বদেশের গৌরবময় বিপ্লবস্মারক উৎসবের মুহূর্তেও এরা বিদেশকে নিজেদের পদানত ব'লে ভাবতে পারছে। লুক্কায়িত ঔপনিবেশিকতা আহ্বান জানাচ্ছে। থেকে থেকে নিশানার মতো ভেসে উঠছে তাত্য়ানার গলা। 'পিগাল... মোঁমার্ত... সাক্রে ক্যর... দ্যাখো, দ্যাখো, কী সুন্দর ঝলমল করছে !' সজ্জিতা সুপুষ্টদেহা নারীরা ইতস্ততঃ হাতব্যাগ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। 'ওরা গণিকা,' জানায় তাত্য়ানা, 'খদ্দেরের আশায় রয়েছে।'

আমার মাথা যখন রীতিমতো বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরছে তখন ওরা এক জায়গায় গাড়ি থামালো। নামতেই ছেলের মুখোশ-পরা একটি মেয়ে কতগুলি কাগজের কুচি আমাদের মুখে ছুঁড়ে দিলো। এর নাম ফুর্তি। রাত তখন পৌনে বারোটা। তাত্য়ানা-জ়াকের মধ্যে তর্ক শুরু হলো আমাদের কোথায় পৌঁছে দেওয়া হবে সে-প্রসঙ্গে। ফেরার পথেও অবিশ্রাম চলতে লাগলো তাদের বাগ্‌বিতণ্ডা। অবশেষে মেয়রী দিসির জনপরিত্যক্ত মেট্রো স্টপের সামনে আমাদের নামিয়ে দিলো জ়াক। তখন ঠিক মাঝরাত।

'জ়াক, জ়াক,' অসহায়ভাবে চীৎকার করলো তাত্য়ানা, 'আমরা এখন কী ক'রে বাড়ি যাবো বলো তো ?—বাস তো বহুক্ষণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

'ট্যাক্সি খোঁজো,' ব'লে এক দ্রুত বাঁক নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো জ়াক আর তার মত্ত বাহন।

আরও আধ-ঘণ্টাখানেক পরে যখন ট্যাক্সি থেকে নামলাম, তাত্য়ানাদের বাড়ি তখন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অন্ধকারেই তাত্য়ানা দরজা খুললো, ভিতরে ঢুকে আবার বন্ধ করলো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে হাত ধ'রে আমাকে পার করালো তাদের আঙিনা। আঙিনার

এক পাশেই দু'খানি ছোট ছোট খুপরিতে প্রাকৃতিক কার্যাদি সারতে হয়। দিনের বেলা লক্ষ্য করেছিলাম যে সেপ্টিক ট্যাংক ব্যবস্থা এবং ফ্লাশ নেই, এখন সভয়ে জানলাম বাতি নেই।

সিঁড়ির নীচে তাত্য়ানা আমাকে বিদায় দিলো। ও শোবে উঠানের পাশেই একটা ঘরে, যেটা আমি দিনের বেলা দেখি নি। মাদাম অনেকক্ষণ শুয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত দেহে উপরে এসে শোবার জন্য তৈরি হয়েছি, এমন সময় দেখলাম—তাত্য়ানার প্রিয় বিড়াল বালিশের উপর প্রচুর লোমত্যাগ ক'রে সুখনিদ্রাভিভূত! আমার 'হুশ্-হাশ্, এই নাম্' ইত্যাদিতে একটুও বিচলিত হলো না। বুঝলাম, বাংলা জানে না এই মার্জার। অগত্যা নিরুপায়। আবার সভয়ে নামলাম,—ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে,—অতিক্রম করলাম অন্ধকার ঘরগুলি, এলাম উঠানে। তাত্য়ানার জানলায় উঁকি মেরে দেখি শুয়ে পড়েছে, তবে ঘুমোয় নি নিশ্চয়ই। ডাকলাম—'তাত্য়ানা, তোমার বিড়াল—'

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম। সত্যিই দুঃখিত। আমার সঙ্গে রোজ ঐ বিছানাতে শুতে অভ্যস্ত কিনা। কী ক'রে বুঝবে বেচারী যে আজ থেকে নতুন ব্যবস্থা হয়েছে।'

তাত্য়ানা তার বিড়ালকে নিয়ে যাবার পর শয্যাস্থ হলাম। নেভি-ব্লু রঙের সুজনীটা বিড়ালের লোমে একেবারেই সমাচ্ছন্ন। আগে লক্ষ্য করি নি। বিড়াল-গন্ধে আমোদিত নরম বিছানায় ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে মনে পড়লো তাত্য়ানার অক্সফোর্ডে উচ্চারিত কথা: 'না না, বিছানা তুমি একটা পাবে... তবে খিদে পাবে তোমার।'

চার

'খিদে পাবে তোমার।' কথাটা মিথ্যে বলে নি তাত্য়ানা। প্রচ্ছন্ন খিদে-খিদে ভাবের সঙ্গে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে যেতে হলো।

আস্তনভ পরিবারে রান্নার পাট সংক্ষিপ্ততম সংস্করণে পৌঁছেছিলো—অনিবার্য কারণে। সকালে উঠে হতো চা, রুশ মতে লেবু দিয়ে, এবং থাকতো মাখন ও পনীর সহযোগে বিস্কুট ও টোস্টের মাঝামাঝি পর্যায়ের প্যাকেটে ক্রেতব্য সামগ্রী। মাদাম আস্তনভ সকাল সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যেই কাজে বেরিয়ে যেতেন, ফিরতেন সেই সন্ধ্যায়। রুটি-পনীর ছাড়া অফিসে কিছুই গ্রহণ করতেন না। ফলতঃ মধ্যাহ্নভোজনের আড়ম্বর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাত্য়ানা সাধারণতঃ দু' বেলাই ছাত্র-ক্যান্টিনে খেতো, আমি আসাতে তার হার একটু কমালো। রাত্রে মাদাম এত ক্লান্ত থাকতেন যে বিশেষ কিছু করতে পারতেন না, তবে রাশি রাশি স্যালাড করতেন, পরম উপাদেয়। আর নিজের জন্য হাঁড়ি না চড়ালেও প্রতি সন্ধ্যায় যেটা তৈরি করতে কখনো ভুলতেন না সেটা হলো তাঁর কুকুরদের জন্য দু'-ডেকচি খাবার, কুস্‌কুস্‌ নামে আফ্রিকান সুজির দানার সঙ্গে তরিতরকারি সিদ্ধ। নিরামিষ আহার থেকেই যথেষ্ট তেজ সংগ্রহ করতো জ়িজ়ি আর বুদা।

সব থেকে দেরি হতো ছুটির দিন দুপুরে খেতে। তাত্য়ানার মামা-দিদিমারা আসতেন, হৈ-হল্লায় বেলা গড়াতো, খেতে খেতে বেলা তিনটা। নতুন জায়গায় খিদে বাড়ে, কে না জানে। প্যারিসের রমণীয় পথে পথে জুলাই মাসের সকাল-দুপুরের ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে ঘুরতে ঘুরতে দু'পাশের লোভনীয় রেস্তোরাঁর খদ্দেরদের প্রতি আমার প্রীতিপূর্ণ মনোভাব উদিত হতো না। তাত্য়ানা কিন্তু নির্বিকার। ও নিজেই স্বীকার করতো, খাবারের চাইতে ঘুমটাই ওর বেশী লোভনীয় মনে হয়। 'আমাকে ডিনার না দাও কিচ্ছু এসে যায় না, কিন্তু ঘুমটি আমার চাই, আমি তন্দ্রালু মেয়ে!'

কাজের ফাঁকে ফাঁকেই নানারকমের সহজ অথচ সুস্বাদ পদ রেঁধে খাওয়াতেন মাদাম আস্তনভ। রসুন দিয়ে প্রেশার-কুকারে বেগুন এবং টোমাটো একত্র রান্না করার প্রণালী তাঁর কাছেই প্রথম শিখলাম। পেঁয়াজ আর বরবটির তরকারি যে কত লোভনীয় হতে পারে তাও দেখালেন তিনিই। এক শনিবার সকালে আমাকে নিয়ে গেলেন ম্যদঁ-র বাজারে। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ: আমাকে বাজার দেখানো, এবং পাড়াপড়শী আর দোকানদারদের ভারতীয় মেয়ে দেখানো। পীচওয়ালার ঝুড়ি থেকে একটি পীচ তুলে মুখে দিয়ে হাসতে হাসতে উধাও হলো স্থানীয় পাগলী। পীচওয়ালা ব্যর্থ হাঁকাহাঁকি করলো, বাজারে উঠলো প্রতিবেশী

দোকানদারদের হাসির হররা। আমার প্রতিশ্রুতিমতো আমি আন্তনভ-পরিবারে ভাত, মাছের ঝোল, মাংসের কোপ্তা, ডিমের ডালনা প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক পদ পরিবেশন করলাম। ঝুরঝুরে ভাত, অথচ ফেন ফেলি নি—তা দেখে মা-মেয়ে উভয়েই মুগ্ধ।

'দ্যাখো দ্যাখো, কী চমৎকার ভাত মা!'

'আমার তো একাল গেলো। শেখ্, তুই শিখে রাখ্ বেটী।'

এক-একদিন তাত্য়ানা সকালে লাইব্রেরিতে চ'লে যেতো। খাঁখাঁ করতো বাড়িটা। ঝিঁঝি বুদা তুজনকে এক ঘরে বন্ধ ক'রে রেখে স্প্যাগেটি সিদ্ধ করতে বা বেগুন-কুমড়ো ভাজতে প্রস্তুত হতাম আমি। সাধারণতঃ মাদাম নার্সিসিয়েন সে-সময়টা বেড়াতে আসতেন। আগাছায় ভর্তি উঠানটার এক কোণে ব'সে রোদ পোহাতেন আর পড়তেন খবরের কাগজ। পরনে সর্বদাই কালো পোশাক, গলায় মুক্তার মালা, মাথায় পিনদ্ধ ঝিনুকের চিরুনি। আমাকে রাঁধতে দেখে এগিয়ে আসতেন।

'ছি ছি, কী যে করে আরাক্সীটা। ঘরে অতিথি এনে সবাই বেরিয়ে যায়। অতিথিকে নিজে ক'রে খেতে হয়। দাঁড়াও, আমি ক'রে দেই।'

'না না, এ কিছুই কঠিন না, খুবই সহজ এটুকু ক'রে নেওয়া। আমার অভ্যাস আছে,' ব'লে উঠি আমি।

বৃদ্ধা সন্দিহান, আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমাদের মতোই—'না না, এসব কি তোমাদের কাজ, এই দ্যাখো না আমি কী সুন্দর কুমড়ো ভেজে দেই।'

অগত্যা তাঁকে খান-তুয়েক টুকরো ভাজবার আনন্দ দিলাম। এক গাল হেসে প্লেটে কালো বিশীর্ণ আধপোড়া টুকরো-তুটি ফেরত নিয়ে এলেন। আকাশনীল চোখ মিটমিট ক'রে প্রশ্ন করেন বৃদ্ধা—'পুড়ে-টুড়ে যায় নি তো? আমি আবার আগের মতো চোখে দেখি না। কী জানি কখন তলায় লেগে যায়।'

'না না, সুন্দর হয়েছে,' আশ্বাস দেই আমি।

'আর তুটে ভেজে দেই?'

'না না, এই যথেষ্ট, অসংখ্য ধন্যবাদ।' ব্যস্ত হয়ে বাধা দিতে হয়।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন মাদাম নার্সিসিয়েন—'এখন কি আর সেরকম হাত আছে আমার। রাঁধতে পারতাম বটে এককালে! আজকাল এরা বলে, আমি নাকি চোখে দেখি না, সব নাকি পোড়াই! আরাক্সীটার রান্নায় একটুও মন নেই। হবেই বা কী ক'রে, যে-কষ্টটা পেয়েছে জীবনে।'

প্লেট থেকে চোখ তুলতে দেখি ভাঙা পাঁচিলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন মাদাম নার্সিসিয়েন। ক্ষীণদৃষ্টি নীল চোখ-তুটি জলে টলমল করছে, কুঞ্চিত তুগ্ধশুভ্র ত্বকের উপর গড়িয়ে পড়েছে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। বুঝলাম, বর্তমান ঝাপসা হয়ে গেছে তাঁর দৃষ্টিতে, অলৌকিক দৃশ্যাবলীরূপে ভেসে আসছে অতীত।

'এ কী, চোখে জল কেন,' অনুযোগ করি, 'কিসের কষ্ট আপনার? আমাকে বলুন, মাদাম।'

অনেকবার বলতে গিয়ে বলতে পারেন না। কেঁপে কেঁপে উঠে বন্ধ হয়ে যায় গোলাপী ঠোঁট-দুটি। তার পর চোখ মোছেন আধময়লা রুমালের প্রান্তে।

'কিছু না, এই আমার ছেলেমেয়েদের কথা ভাবছিলাম। আমার ছেলেগুলো এক-একটা এক-এক মূর্তিমান। ছোটটাকে তুমি দেখছো। সেটা ভালোই, তবে তার বৌটা যেন কেমন, ঠিক আপন হলো না। তাই তো ওদের বাড়িতে বেশী দিন থাকতে পারি না। মন টেঁকে না। চ'লে আসি এখানে।

'আমার বড় ছেলে ছিলো দারুণ সুপুরুষ। এখনও দেখলে বোঝা যায়, যদিও চুলগুলি সবই সাদা হয়ে গেছে। এই ছেলেটা আমার একটু দুরন্তই ছিলো, কত মেয়েকে যে নাচিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আর মেয়েগুলোও নাচতো। সব ওর প্রেমে হাবুডুবু খেতো। প্রথম বৌটাকে ডিভোর্স দিলো। পরের বৌটা গেলো ম'রে। তৃতীয় বৌটা বেজায় বাচ্চা, এখন সেয়ানা বাবুটি কচি বৌয়ের খামখেয়ালের গোলাম।

'আমার মেজ ছেলে বিয়ে করলো এক ইংরেজ মেয়েকে। থাকতে গেলো শেষ পর্যন্ত আমেরিকায়। সাত বছর পরে এই হঠাৎ গত মাসে ইয়োরোপে এলো। কী, না তার অর্বাচীন ছেলেমেয়েদের ইয়োরোপ দেখাবে। তিন মাস ইয়োরোপে ভ্রমণ করলো। ফিরে যাবার সময় একটি দিন—না, কয়েক ঘণ্টা মাত্র—এনগেজমেন্ট ক'রে মা-ভাই-বোনদের সঙ্গে দেখা।'

রুমালে আবার চোখ মোছেন মাদাম নার্সিসিয়েন। 'তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তোমাদের দেশেও তো পারিবারিক বন্ধন খুব দৃঢ়। সাত বছর বাদে ছেলে দেশে ফিরলো—মাকে দেখতে নয়, বাচ্চাদের ইয়োরোপ দেখাতে। আমেরিকার টাকায়। আমেরিকানদের কাছে ইয়োরোপ প্রমোদ-উদ্যান। ডলার খরচ ক'রে জাহাজে চড়ো, বেড়িয়ে যাও, বাচ্চাদের দেখিয়ে নাও। কিন্তু মা, যে-মা অপেক্ষা ক'রে রয়েছে বছরের পর বছর, তার জন্য কয়েক ঘণ্টার বেশী খরচ করা অপব্যয় মাত্র।'

আমার মুখে আসে সান্ত্বনার গুঞ্জন—'তবু তো আপনার ছেলেমেয়েরা সবাই মোটামুটি সুখে স্বাস্থ্যে জীবিত আছে, মাদাম। সেটাই তো সবচেয়ে আনন্দের কথা।'

'ঠিক। তা আছে। ওদের শিক্ষার জন্য কি কম খরচপত্র করেছি আমরা? আমার স্বামী আর আমি কী পরিশ্রমই না করেছি ওদের গ'ড়ে তুলবার জন্যে। আজ তুমি দেখছো বটে আরাক্সীর এই ভাঙা ঘরদোর, কিন্তু চিরকাল এরকমটা ছিলো না। এখনকার ব্যাপার হলো এই—আরাক্সী রুশ ছাপাখানাতে যে-কাজটা করে তাতে বিশেষ আয় হয় না, খাওয়ার খরচ-টরচ চলে মাত্র। ভাগ্যিস বাড়িটার জন্য ভাড়া দিতে হয় না, তাই চ'লে যাচ্ছে। আর এই ঝুরঝুরে বাড়িটার পিছনে কে-ই বা টাকা ঢালবে বলো? তাত্যানার যদি একটা পাকাপাকি

চাকরি জুটতো, তবে কিস্তিতে একটা ফ্ল্যাট কিনতে পারতো। ফ্ল্যাটের যা দাম প্যারিস শহরে—'

'কিন্তু তাত্য়ানা যে বলে বাড়ির চাইতে গাড়ি কেনাই আপাততঃ ওর পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় ? ও বলে গাড়ি কিনলে ও তাতে ক'রে সারা প্যারিস শহর চ'ষে বেড়াবে ঘরে ঘরে রুশ ভাষা শিখিয়ে। রুশ ভাষায় প্রাইভেট টুইশনি ক'রে বড়লোক হওয়া নাকি প্যারিসে মোটেও অসম্ভব নয়। সেই টুইশনির টাকা জমিয়ে নাকি বাসাবদল হবে অদূর ভবিষ্যতে। অক্সফোর্ডের চাকরির প্রায় পুরো টাকাটাই তো এ উদ্দেশ্যে জমছে। কিন্তু মাদাম, উঠানে যে-বিরাট গাড়িটা রয়েছে, ওটা কার ? একটা গাড়ি থাকতে আরেকটা দিয়ে কী হবে ?'

'ওটা হলো পাপের গাড়ি। তবে সবটাই শোনো। এখন আমাকে লোলচর্ম দেখছো বটে, কিন্তু গত শতাব্দীর শেষে যখন প্রবাসী আরমানীদের সম্মানার্থে লণ্ডনে বিরাট নৃত্যোৎসব হয়, তখন সে-উৎসবে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে ছিলাম আমিই,'—লজ্জিত হাসি হেসে পুরোনো দিনের কথা স্মরণে আনেন মাদাম নার্সিসিয়েন,—'হ্যাঁ, সেই নাচেতেই তাত্য়ানার দাদামশায়ের সঙ্গে প্রথম দেখা। এক মাসের মধ্যেই সাক্ষাৎ, প্রেম, এবং বিবাহ। স্ফূর্তিতে ভরপুর সুপুরুষ প্রাণোচ্ছল ছিলো আমার স্বামী। বাকু-তে ছিলো ওর কারখানা। বাকু জানো তো—ক্যাস্পিয়ানের ধারে বিখ্যাত শহর বাকু। বাকুতেই আমার ছেলেমেয়েদের জন্ম। আমাদের সমাজে তখন রেওয়াজ ছিলো ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য ইয়োরোপের কোনো বড় শহরে কয়েক বছর তাদের স্কুলে বা কলেজে রাখা। এককালে আমিও যেমন ছিলাম, তেমন আমার আদরের আরাক্সীকেও বছর দু'-এক ইংলণ্ডের বোর্ডিং-স্কুলে রেখেছিলাম। বাকুতে ছেলে-বুড়ো সবাই আমার স্বামীকে দারুণ পছন্দ করতো। কারখানার শ্রমিকেরা ওকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো। ওদের জন্য ও একাধিক স্কুল খুলেছিলো। সেসব স্কুলে আমিও পড়াতাম। বিয়ের পর আমি প্রত্যেক বছরই একবার ইয়োরোপে আসতাম, আমার সমস্ত মার্কেটিং সেখানেই করতাম। লণ্ডন থেকে সারা বছরের জন্য বাজার করতাম ছেলেমেয়েদের জিনিসপত্র।

'এখানকার মেয়েদের এখন যেমন দ্যাখো, আমাদের জীবন সেরকম ছিলো না। গলায় হার পরতাম, কান বিঁধিয়ে দুল পরতাম।' এখনও মনে পড়ছে বাকুতে একটা দিনের কথা। আরাক্সী প্রথম নাচে যাবে, ওর বাবা সন্ধ্যায় সবে কারখানা থেকে ফিরেছেন। এসেই ডাকতে লাগলেন—আরাক্সী, আরাক্সী ! আরাক্সী এলো। লম্বা সাদা পোশাকে কী মিষ্টিই না দেখাচ্ছিলো ওকে। একটা ছোট বাক্স থেকে একটা মুক্তার মালা নিয়ে বললেন, দেখি তো তোকে কেমন লাগে এটাতে। তার পর বললেন : বেশ দেখাচ্ছে ; আচ্ছা, তবে তুই ওটা রেখে দে, ওটা তোকেই দিলাম। আরাক্সী তার বাবাকে চুমু খেয়ে ধন্যবাদ জানালো। উনি ঐরকমই ছিলেন, যখন-তখন হাতে উপহার নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। গয়নাগাঁটি কিছু কিছু ছিলো আমাদের। এখন আমার গলায় এটা আর আরাক্সীর বুঝি একটা আছে ; আর কিচ্ছু নেই।

বেচারী আরাক্সীর শখ আছে একটু আধটু। ওর ইচ্ছা নিজের মেয়েটার হাতে দু'-একটা গয়না তুলে দেয়। সাধ্য কই? মেয়েকে বুঝি একবার একটা ফিরোজার আংটি দিয়েছিলো। তা সে-মেয়ের যে কী হলো, বছর কুড়ি বয়স পর্যন্ত এটা সেটা বেশ পরতো। তার পর থেকে হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে দিয়েছে, হাতে একটা পাতলা ব্রেসলেট ছাড়া। ওকে নাকি আর মানায় না। বাজে কথা। কী বলো?'

'বাজে কথা বৈকি,' সায় দেই আমি। তাত্য়ানা তার অল্প দামের 'কস্টিউম জুয়েলারি'র সংগ্রহ আমাকে দেখিয়েছিলো। ভারী সুন্দর সুন্দর জিনিস। ওর জীবনের আফগান পর্যায়ে ও খুব ওসব পরতো। তার পর...। আধো চাঁদের নকশায় রুপোর উপর মিনে-করা একজোড়া দুল এবং লকেট-সংবলিত হারের একটা সেট ছিলো। সেটা সে আমাকে দেবেই। জিনিসটা ইরানী, সে এক বেদেনীর কাছ থেকে কিনেছিলো। 'বিশ্বাস করো, আমি আর কখনোই পরবো না। তুমি নাও, পরবে, আর আমার কথা মনে করবে।'

মাদাম ব'লে চললেন, 'তার পর এলো আমাদের জীবনের সব থেকে বড় পরীক্ষা, প্রথম মহাযুদ্ধ আর রুশ বিপ্লব। তখন দলে দলে বুর্জোয়া রুশ এবং আরমানীরা ইয়োরোপে চ'লে যেতে শুরু করেছে। বাকু থেকে একাধিক পরিবার বিদায় নিলো। নার্সিসিয়েন প্রথমে তো কিছুতেই তার ভিটেমাটি ছাড়বে না। সারা শহরে তার প্রতাপ প্রতিপত্তি অশেষ ছিলো। সবাই তাকে আশ্বাস দিলো, তার শ্রমিকেরা প্রাণ পণ ক'রে তাকে রক্ষা করবে কথা দিলো। ভয়, আশা, আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা, উত্তেজনা—এসবের মধ্য দিয়ে তখন আমাদের দিন কাটছে। ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ কী, আরমানীদের কী হবে, আমরা দেশত্যাগ করবো কিনা, এই নিয়ে চলতো সশঙ্ক জল্পনা। এসব গোলমালের মধ্যেই এক ফাঁকে আরাক্সীটার পাখনা গজালো। এক ছুটিতে ইয়োরোপ থেকে বাকু ফিরেছি—তখন চতুর্দিকে অশান্তি, বাকুতে আমাদের খুঁটি ন'ড়ে উঠছে—হ্যাঁ, ফিরেছি কি চিঠি এলো। তিনি লণ্ডনে এক দেশত্যাগী রুশের প্রেমে পড়েছেন, এবং অব্যবহিত কাল পরেই প্যারিসে শুভবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। দ্যাখো কাণ্ডটা। ব্যাপার কী, না মায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তিনি। তখন কীই বা ওর বয়স। অত বিবেচনা করে নি। আরাক্সী যে খুব একটা রূপসী ছিলো তা নয়, তবে মিষ্টি ছিলো অসম্ভব—'

'কী যে বলেন, মাদাম,' বাধা দিয়ে উঠি আমি, 'মাদাম আস্তনভের কৈশোরের প্রতিচ্ছবি যেন দেখি নি আমি! মনভোলানো মিষ্টি হাসিতে ভরা মুখখানি। সুন্দরী ছিলেন না তিনি বিশ্বাস করি না আমি। এখনও প্রৌঢ়ত্বের অন্তরাল থেকে হাতছানি দিচ্ছে তাঁর যৌবনের লাবণ্য। সৌন্দর্যের বড় কঠিন সংজ্ঞার্থ দিচ্ছেন আপনি। নিখুঁত সুন্দরী কমই দেখা যায় পৃথিবীতে, এবং তেমন সৌন্দর্যের প্রয়োজনও কম। কিন্তু হৃদয়ের প্রীতি এবং বিবেকের নির্মলতা থেকে উৎসারিত যে-মোহন হাসিটুকু, তার স্পর্শই ঐন্দ্রজালিক।

মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকান বৃদ্ধা—'তোমার কথাই ঠিক। আমিও তাই বলতে যাচ্ছিলাম। পেটের মেয়ের প্রশংসা বেশী করতে চাই না। কিন্তু আরাক্সীর মনটা ছিলো সোনা

দিয়ে তৈরি। নিষ্পাপ হাসিটি ছিলো তার ব্রহ্মাস্ত্র। "বিউটি"র সংজ্ঞার্থ কঠিন বটে, কিন্তু "স্থইটনেস", "লাভলিনেস", "চার্ম"—এ-সমস্ত বলতে আমরা যা বোঝাই সে ছিলো তারই রূপায়ণ।'

অনুমান করলাম মাদাম নার্সিসিয়েন নিজে ছিলেন তিলোত্তমা, ক্ল্যাসিক অর্থে। রূপশালিনী এবং দীপ্ত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী। উপরন্তু বিত্তশালী ঘরের বৌ। তাঁর মেয়ের রূপে বা মেধায় মায়ের মতো হীরার ধার হয়তো ছিলো না, কিন্তু ছিলো মুক্তার মৃদু আলো: ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি অবনী বহিয়া যায়।

'কিন্তু কী জানো, আন্তনভ আসলে ওর যোগ্য ছিলো না। একে একে এলো তিনটি ছেলেমেয়ে। প্রথম প্রথম মনে হতো সবই বুঝি ঠিক চলছে। কিন্তু আস্তে আস্তে গেলো সবই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সব অন্যরকম হয়ে গেলো ওর জীবনে। এই বাড়িটায় তখন উঠে এলো আরাক্সী। আমার ছোট ছেলে যোগাড় ক'রে দিলো। আগে তো কারখানা ছিলো এটা। এরা কোনোমতে বাসযোগ্য ক'রে নিয়েছে মাত্র। প্রথমে ইচ্ছা ছিলো দু' বছর পরই ভালো একটা ফ্ল্যাটে উঠে যাবে। কিন্তু যুদ্ধোত্তর আর্থিক অবস্থা যে কী হবে তা কি আগে কেউ ভাবতে পেরেছিলো? পরের বছর, পরের বছর, করতে করতে এই দ্যাখো না বারো-চোদ্দ বছরের উপর হয়ে গেলো।

'আর আন্তনভ? তাকে আর "জামাই" ব'লে ভাবতে পারি কি? তবু সে যে আমার নাতি-নাতনীদের বাপ! সে এখনও আসে বটে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু না আসলেও পারে। ছেলেমেয়েরা, বিশেষতঃ তাত্য়ানা, তাকে দু' চক্ষে দেখতে পারে না। পারবেই বা কী ক'রে? অন্য একটা মেয়েমানুষকে নিয়ে যে ঘর করছে সেরকম বাবাকে কোন্ মেয়েই বা সহ্য করতে পারে? মায়ের দুঃখে বুক ফেটে যায় না তার? মায়ের দুঃখ মেয়ে বোঝে। তাই তার দুর্জয় অভিমান। বাপবেটীতে দেখা হলেই একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যায়।

'আজকাল আন্তনভ অবশ্য মধ্যে মধ্যে আর্থিক সাহায্য করতে চায়, কিন্তু মা-মেয়ে তা স্পর্শ করবে না। উঠানের গাড়িটা তো আন্তনভেরই। রেখে গেছে; ইচ্ছা, ছেলেমেয়েরা চালায়। কিন্তু ওরা ও গাড়ি ছোঁবে না। ওরা বলে ওটা পাপের গাড়ি। বিরাট যন্ত্রটা ধূলায় প'ড়ে রইলো। আরাক্সীর কিন্তু সহ্যশক্তি কম না। এই যে এত যন্ত্রণা, এর মধ্যেও মুখের হাসিটি অবিকল আছে। আইনের দরজায় যাবে না, আর্থিক ক্ষতিপূরণ নেবে না, আংটিটা ছাড়ে নি। স্বামীর নামেই নিজেকে জগতের কাছে জানাচ্ছে, ছেলেমেয়েদের পদবীও বাপের পদবী অনুসারেই। তাদের যত্ন ক'রে রুশ শিখিয়েছে: দেখেছো তো, রুশেই কথাবার্তা বলে তাত্য়ানার সঙ্গে। আর কখনো রুশদের একবিন্দু নিন্দা শুনবে না কেউ আরাক্সীর মুখে।

'চোখের সামনে আমার আদরের বড় মেয়েটার অবস্থা নামতে দেখলাম। সাহায্য করতে পারি নি কিছুই। বাকু থেকে শেষ পর্যন্ত চ'লে আসতে হয় আমাদের। নার্সিসিয়েনের অনেক টাকা এক জার্মান ব্যাংকে ছিলো। সব টাকা গেলো। আমার ছোট ছেলেটাই শেষ

পর্যন্ত সব থেকে বেশী সাহায্য করেছিলো তার দিদিকে। অন্যেরাও কিছু কিছু করেছিলো অবশ্য। ওদের সবাইকে যে হাজার বিপদের মধ্যেও আপ্রাণ কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, সেটাই সব থেকে কাজের কাজ করেছিলাম। সব ক'টাই নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়েছে। ক'রে খাচ্ছে তো অন্ততঃ। কেউ ব'সে নেই।

'তবে এত যে করলাম, তা সত্ত্বেও একটা স্থির গৃহ পেলাম না আজ পর্যন্ত। কোথায় থাকি। একটা সমস্যা। পালা ক'রে ক'রে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে থাকি। প্রধানতঃ ছোটটার ওখানেই। তবে ওর বৌটা এক-একদিন মেজাজ এমন খারাপ ক'রে দেয় যে তখনই পোঁটলাপাঁটলি নিয়ে চ'লে আসি এখানে। এখানে থাকবার জায়গাই নেই। কোনোমতে ভাঙা খাট বা সোফাতে রাত কাটাই, মাথার কাছে হোল্ডলটা রাখি। এমনই দুনিয়ার নিয়ম। আমার নার্সিসিয়েন ছিলো আদর্শ স্বামী। অথচ দ্যাখো, সে চ'লে যাবার পর থেকে তার বিধবা স্ত্রীর আর ঘর নেই।'

মুহূর্তে যেন ইন্দির ঠাকরুনটি হয়ে ওঠেন এই একদাবিদগ্ধা বৃদ্ধা। মনে পড়ে আমাদের দেশের প্রবচন, ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

জ়িজ়ি-বুদার ভৌ-ভৌ শব্দে তাত্‌য়ানার আগমন স্থচিত হয়। গল্প করতে করতে কখন বেলা গড়িয়ে বিকাল হয়েছে। পোড়া কুমড়োর অবশিষ্টাংশ রোদে শুকিয়ে প্লেটের গায়ে আঠার মতো আটকে গেছে।

'দিদিমা বুঝি সুখদুঃখের গল্প করছে তোমার সঙ্গে ?'—তাত্‌য়ানার গলা শোনা যায়।

সন্ত্রস্ত হয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ান বৃদ্ধা—'না না, তোর বন্ধুকে এই ছু'-চারটা সাধারণ কথা বলছিলাম, আর কী।' আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে যান মাদাম নার্সিসিয়েন।

'কী ব্যাপার, সারা দুপুর গল্প ? অর্থাৎ ঘরোয়া, সাংসারিক কথাবার্তা ?' হাসতে হাসতে বলে তাত্‌য়ানা। 'ঘরের সুখদুঃখের কথা হচ্ছিলো কিনা বলো। ঠিক ধরি নি ?'

হঠাৎ প্লেটের উপর চোখ পড়তেই আবার চোখ তোলে তাত্‌য়ানা—'সর্বনাশ, দিদিমা বুঝি কুমড়ো-ভাজা খাইয়েছে তোমাকে ? দিদিমার ধারণা আসলে দিদিমা চোখে ঠিকই দ্যাখে। তোমাকে একাটি পেয়ে তাই আজ তোমার উপর হয়েছে এক্সপেরিমেন্ট। জানে তো আমরা ধরা দেবো না। বেশ, কেমন লাগলো কুমড়ো-পোড়া সেটি এবার আমায় বলো।'

'এই, চুপ করো, তাত্‌য়ানা,' বলি আমি, 'বুড়ী দিদিমা সম্বন্ধে অমন ক'রে বলে না।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, সুখদুঃখের গল্প শুনে মনটি গলেছে।'

তাত্‌য়ানার বিড়াল মিঁউ মিঁউ শব্দে রান্নাঘরের জানলা থেকে অনুনয় জানাতে থাকে। ওর কাছে ছুটে যায় তাত্‌য়ানা, রান্নাঘরের তাক হাতড়ায়। কিন্তু দুধের বোতল শূন্য, সব ফুরিয়ে গেছে।

'ষাট ষাট, সোনামণি বিড়াল আমার, তোর জন্য দুধ নেই বুঝি? কী অঘটন! তাই তো, একবার দোকানে যেতে হয়, নয়তো আবার বন্ধ হয়ে যাবে।

এক ছুটে তাত্য়ানা এক বিরাট বোতল দুধ কিনে আনে, একটা সাধারণ বোতলের দু'-গুণ হবে। ঢক্ঢক্ ক'রে একটা বড় পিরিচে ঢেলে দেয়, আর বলতে থাকে—'খা, খা, লক্ষ্মী বিড়াল।'

তাত্য়ানাকে নিজে কোনো দিন ঢেলে এক গেলাস দুধ খেতে দেখি নি। তার সময় হতো না, বা মনে থাকতো না! কিন্তু তার বিড়ালের জন্য প্রতিদিন বড় বোতলের আধ বোতল দুধ বরাদ্দ ছিলো। আর সে-দুধের স্বাদ? তার ঘনত্ব? দুধ যে সেরকম হতে পারে, তাই কলকাতার লোক ভুলে গেছে। মনে পড়লো কলকাতায় আমাদের পুষির কথা। বাড়ির সকলের জন্য বরাদ্দ হবার পর অবশিষ্ট কয়েক হাতা দুধ, তাতেই তার কী কৃতজ্ঞ গোঁফ-চাটা! তা ছাড়া আমিই যদি কোনো দিন বিকালে বাড়ি ফিরে হঠাৎ দরকারের জন্য দুধ কিনতে বেরোতাম, তবে কি কলকাতার মতো 'আন্তর্জাতিক' শহরে মাথা খুঁড়েও এক বোতল দুধ পেতাম?[২]

পাঁচ

আমাদের রাস্তাটির নাম ছিলো আভেনিউ ওগুস্ত্ রদ্যাঁ। ভাস্কর রদ্যাঁ-র নামে। বাড়ির উল্টো দিকেই একটি ছোটখাট রদ্যাঁ মিউজ়িয়ম। সে-বাড়িতে রদ্যাঁ বেশ কিছুকাল ছিলেন। প্যারিসের বৃহত্তর রদ্যাঁ মিউজ়িয়ম দেখবার পর এক সন্ধ্যায় উৎসাহিত বিবরণ দিচ্ছি; মাদাম আন্তনভ ব'লে উঠলেন, 'সে কী? বড় মিউজ়িয়ম দেখা হয়ে গেলো ঘরের সামনের ছোট মিউজ়িয়ম দেখার আগেই? চলো, কালকে রোববার আছে, কালকেই দেখাবো।'

এ ঘটনাটি আমার এ অধ্যায়ের যোগ্য উপক্রমণিকা। শহর দেখতে এসেছি সত্যিই, কিন্তু শহরতলির আনাচে-কানাচে যে-গল্প লুকিয়ে আছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়?

চতুর্দিকে আরমানী পল্লী। ছোট ছোট শ্রীসম্পন্ন গৃহস্থবাড়ি। একফালি বাগান, একটু লতার আভাস, কয়েকটি টব, কাঠের একরত্তি লেটারবক্স, বাগানের গেটের ফলকে পরিচ্ছন্ন সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তি: দুষ্টু কুকুর।

রাস্তার মোড়ে আরমানী মুদীর দোকান। সেখান থেকে পয়সা গুনে গুনে সস্তা থেকে আরও সস্তার জিনিস কেনার চেষ্টা করতাম। 'একটা বড় পাতি লেবু, দুটো টোমাটো, এতটুকু মাখন—এই এতটুকু, এক চিলতে, যতটা কম আপনি বেচবেন।'

আমার উক্তি শুনে বিশাল গোঁফের অন্তরালে মৃদু হাসতো আরমানী মুদী। এ দোকানের মস্ত সুবিধা এই ছিলো, কম-কম ক'রে জিনিস কেনা যেতো। বড়লোক পাড়ার অহংকারে ফেটে-পড়া দোকান নয় যে এক পাউণ্ডের নীচে কিছু চাইতে তোমার লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

এই দোকানটার সম্পূর্ণ উল্টো ধরণের কতগুলো মুদীর দোকান দেখেছিলাম প্যারিসের এক জনবহুল ঘিঞ্জি অঞ্চলে। সরু একটা গলি দিয়ে হাঁটছি, দু'ধারে অজস্র সাদাসিধে গোছের দোকান—মনিহারী, মুদীর, এইসব। কিন্তু সব দোকানেই লক্ষ্য করছি খুব বড় বড় বয়াম। হঠাৎ একটা দোকানে চোখে পড়লো বিরাট বিরাট বয়ামে রাখা অত্যন্ত লোভনীয় চেহারার হৃষ্টপুষ্ট কাজুবাদাম, আর ঐরকমই বিরাট বিরাট বয়ামে নানারকম প্রাচ্য মশলাপাতি। তাত্য়ানাকে বললাম, 'দেখি তো কী কী আছে।' দেখলাম কালো জিরা পর্যন্ত আছে। অবাক হয়ে দেখছি; ছোকরা-মতো দোকানদার এগিয়ে এলো। কৌতূহলভরে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম ঐ মশলাটাকে কী নামে ডাকা হয় এ দেশে। ছোকরা লজ্জা পেয়ে গেলো, আমতা আমতা ক'রে বললো, ফরাসীতে কী বলে সে জানে না, তবে তাদের ভাষাতে অমুক বলে। শব্দটি ধরতে না পারায় আরও কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের কী

ভাষা ?' কিন্তু সে কিছুতেই বলবে না। শুধু জানালে, 'ঐ একটা প্রাচ্য ভাষা।' আমরা মনে মনে ভাবলাম, আরবী হবে, চেহারাতেও খানিকটা সে-ছাপ। যাই হোক, আমরা একটা ছোট প্যাকেটে কিছু কাজুবাদাম কিনতে চাইলাম । সে দুঃখিত হয়ে জানালো যে তার পাইকারী দোকান, অমুক ওজনের নীচে সে বেচতেই পারে না। আমরা একটু অবাক হলাম।

বাইরে এসে হাঁটতে হাঁটতে আরও তীক্ষ্ণ নজরে তাকালাম সারি সারি দোকানগুলোর দিকে। সাইনবোর্ডগুলিতে সত্যিই তো একটা অন্য ভাষা, মোটেও ফরাসী নয়। আরে, এ যে হিব্রু হরফ ! একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি আমরা। এতক্ষণে রহস্যভেদ হলো। এ হলো ইহুদীপট্টি, সামনে ঐ তো ইহুদীদের শূকরবর্জিত মাংসের দোকান, শাস্ত্রসম্মত উপায়ে তৈরি বড় বড় সালামির তাল ঝুলছে। পরে আমার এক ইহুদী বান্ধবীকে ঘটনাটা বলি। সে উপভোগ ক'রে বলে, 'ইহুদীরা যেখানে যায় সেখানে পাইকারী ব্যবসা শুরু করে, ব্যবসায়ী বুদ্ধি ষোলো আনা কিনা ! ওসব খুচরো কারবারের মধ্যে ওরা নেই। তাই তো অন্য ব্যবসায়ীরা ওদের দু' চক্ষে দেখতে পারে না !'

কিন্তু প্যারিসে তখন প্রচণ্ড গরম, খাবার জিনিস মোটে থাকছে না, মাখন-টাখন গ'লে যাচ্ছে ; কাজেই আমাদের আরমানী মুদীর খুচরো ব্যবসাই আমাদের প্রয়োজন ঠিকভাবে মেটাতে পারতো। আন্তনভ-গৃহে রেফ্রিজরেটর ছিলো না। ফরাসীরা খুব দই খায়, বিশেষতঃ ছাত্র-ক্যান্টিনে তো প্রায়ই দই দেয়। গরমের দিনে দইয়ের মতো আর কী আছে ? সাতপাঁচ ভেবে একদিন ঠিক করলাম পাড়ার দোকানে দই রাখে কিনা খোঁজ করতে হবে। যদি রাখে তবে বিশেষ সুবিধা, তা ছাড়া সামগ্রীটি সস্তা হবারই সম্ভাবনা। এদিক ওদিক তাকিয়ে যখন পরিচিত কার্টন বা শিশির হদিস পেলাম না, তখন বাধ্য হয়েই প্রশ্ন করতে হলো।

'মাপ করবেন মহাশয়, আপনি কি দই রাখেন ?'

'বিয়াঁ স্যুর ! রাখি বৈকি !' হেসে ওঠে মুদী। বুঝলাম প্রশ্নটা তার কাছে মজাদার ঠেকেছে। তার দোকানে দই থাকবে না এ যেন অভাবনীয়। আরও মজা এই যে বড় বড় হরফে 'yaourt' অর্থাৎ 'দই'-লেখা কার্টনগুলি একেবারে আমার নাকের ডগার সামনে সাজানো।

কী আশ্চর্য, আমার চোখ এড়ালো কী ক'রে ? তাত্য়ানাকে ঘটনার বিবরণী দিতে সেও হেসে ওঠে—'আমার কী মনে হয় জানো ? মঁসিয়ের শাঁসালো গোঁফজোড়ার ভয়েই তুমি কাউন্টারের দিকে ভালো ক'রে তাকাতে পারো নি, তুমি "ইনহিবিটেড" ছিলে, তাই দইয়ের পাত্রগুলি তোমার নজরে আসে নি !'

যাই হোক, এক-এক কার্টনের দাম আমাদের হিসাব অনুসারে মাত্র ত্রিশ নয়া পয়সা হওয়ায় আমি সন্তুষ্ট হলাম। এর পর থেকে তৃষাতুর দুরন্ত দুপুরে আমাকে প্রায়ই দধিক্রয়ে ব্যস্ত দেখা যেতো। একদিন তাত্য়ানাকে ঘোল তৈরি ক'রে খাওয়ালাম ; অবশ্য ঘোল খাওয়ানোর বিশেষ অর্থটি করি নি !

বিকেলের পড়ন্ত রোদে বাগানে ইজ়িচেয়ার টেনে শুয়ে থাকতো বা কাগজ পড়তো পড়শীরা, বিশেষতঃ বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। আমি প্রায়ই সে-সময়ে শহর থেকে বাড়ি ফিরতাম, পাড়ার বুড়োবুড়ীরা আমাকে চিনে গেলেন। আরমানীদের মধ্যে যৌথ-পরিবার-প্রথা এখনও খানিকটা চালু আছে। আমাকে দেখেই বুড়োরা ফেলতেন কাগজ, বুড়ীরা হাতের উল-কাঁটা। ডাক দিতেন ছেলে, ছেলের বৌ, নাতিনাতনীদের। কৌতূহলী মুখে ভ'রে উঠতো ছোট ছোট জানলাগুলি।

একটি বাড়ির একতলায় ছিলো এক ছোট্ট দর্জির দোকান, পরিচ্ছন্ন এবং ঘরোয়া, ঠিক যেরকম কলকাতায় মধ্যে মধ্যে চোখে পড়ে। জানলায় ব'সে বৈদ্যুতিক সেলাই-কলে কাজ করতো এক আশ্চর্য রূপসী ; কুচকুচে কালো তার চুল, টিকালো নাক, টানা টানা কাজল-পরা কালো চোখ। তার মুখের দিকে তাকালে তার পূর্বপুরুষরা যে প্রাচ্য সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতো না। বেশ কয়েক গজ দূর থেকে তার সেলাই-কলের একটানা ঘর্ঘরধ্বনি শুনতে পেতাম, বুঝতাম সে জানলায় আছে। যখন তার জানলার সামনে আসতাম, হঠাৎ থেমে যেতো তার কলের শব্দ। কয়েক সেকেণ্ড সব স্তব্ধ। যখন আমি তার দৃষ্টিপথ অতিক্রম ক'রে চ'লে এসেছি, তখন আবার শুনতাম সেই একটানা ঘর্ঘর।

একদিন চোখাচোখি হয়ে গেলো। টেবিলে একরাশ ছাপা স্থতী কাপড়, দেয়ালে ঝুলছে সদ্য-তৈরি-করা ফ্রক, টান ক'রে বাঁধা খোঁপাটি, কানে একজোড়া মোটা সোনার মাকড়ি, বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে আমাকে নিরীক্ষণ করছে ডাগর ভ্রমরকৃষ্ণ কৌতূহলী দুটি চোখ। জুলাইয়ের তন্দ্রালু দুপুরে ম্যদঁ-র ধূলিম্লান ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উন্মীলিত পদ্মের মতো সেই চোখজোড়া দেখে অভিভূতের মতো উপলব্ধি করলাম আমাদের অতিপরিচিত রবীন্দ্রনাথের সেই পঙ্‌ক্তিটির তাৎপর্য : 'দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।'

তাত্য়ানাকে পরে তার পরিচয় শুধিয়েছিলাম। 'কানে-মাকড়ি মেয়েটির কথা বলছো তো ? হ্যাঁ, আরমানী বৈকি,' জানায় সে, 'ওরই তো দোকান। অপূর্ব দেখতে, তাই না ?'

আরেক দিন ঘটলো পর-পর দুটি মজার ঘটনা। এক দুপুরে বাড়ি ফিরছি, আমাকে দেখতে পেয়ে কোনো-এক প্রতিবেশীর 'দুষ্টু কুকুর' ভৌ-ভৌ শব্দে প্রচণ্ড আপত্তি জানাতে লাগলো। এরকম একজন অভাবনীয় আগন্তুক হেঁটে যাবে, অথচ কুকুর আপত্তি জানাবে না, তা-ও কি হয় ! দুটি ছোট্ট মেয়ে দৌড়ে এলো। আমাকে দেখে লজ্জা-লজ্জা মুখে তাকিয়ে রইলো।

'দুষ্টু কুকুর, তাই না ?' বলি আমি।

'না না, কুকুর ভালো, শান্ত,' প্রতিবাদ করে তারা, তার পর নিজেদের মধ্যে কী যেন ফিসফিস করে। সসংকোচে প্রশ্ন করে—'তুমি কি আরমানী ?'

'না।'

'তবে ? ফরাসী !'

'না, তাও না।'

'তবে ?'

'আমি অ্যাঁদিয়েন।'

'অ্যাঁদিয়েন !' পরস্পর চোখাচোখি করে তারা ; অভিভূত হয়ে পড়ে তাদের ছোট্ট মুখদুটি।

'কিন্তু তোমার পালক কই, আর তোমার তূণ, বাণ ?'

মুহূর্তে বুঝতে পারি বেচারাদের অবস্থা ; অ্যাঁদিয়েন বা ইণ্ডিয়ান বলতে এরা রেড ইণ্ডিয়ানই বোঝে শুধু। হেসে বলি, 'আমি আমেরিকার অ্যাঁদিয়েন নই, আমি অ্যাঁদ-এর অ্যাঁদিয়েন !'

এর উত্তরে অত্যন্ত দ্রুত স্বরে তারা যা গুঞ্জরণ করে আমি তা ধরতে পারি না। হেসে বলি—'একটু আস্তে আস্তে বলো, অত তাড়াতাড়ি বললে আমি বুঝতে পারি না।'

'কেন পারো না ?'

'আমি যে ফরাসী নই।'

'তবে তুমি সত্যি কী ?'

'ঐ যে বললাম, অ্যাঁদিয়েন।'

'তুমি কি সত্যিই তাই ?'

'হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই। আমি একেবারে আসল, খাঁটি অ্যাঁদিয়েন।'

'আসল অ্যাঁদিয়েন !' অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে ওঠে তারা।

লক্ষ্য করি একটা ভয়ের ছায়া যেন ওদের মুখে এসে পড়েছে। হঠাৎ দেখি এক দৌড়ে দুজনেই অন্তর্হিত।

তাত্‌য়ানাদের বাড়ির সামনে এসে দেখি, কী সর্বনাশ, দরজা চাবি-বন্ধ। এখন আমি ঢুকি কী ক'রে ? শনিবারের দুপুর ; তাত্‌য়ানা তো লাইব্রেরিতে, আর মাদাম নিশ্চয় দিবানিদ্রাভিভূত। কিন্তু কী আশ্চর্য, এ সময়ে দরজা তো কোনোদিন বন্ধ থাকে না। তাত্‌য়ানা তাই আমাকে কোনো চাবিও দেয় নি। ব্যস্ত হয়ে কলিংবেলের অনুসন্ধান করি। চিহ্নমাত্র দেখি না। দেশী মতে যে সশব্দে কড়া নাড়বো তারও উপায় নেই। কারণ, কড়া-ই নেই। অগত্যা জোরে টোকা দিতে থাকি, যদিও জানি উঠান ঘর বারান্দা রান্নাঘর ইত্যাদি পেরিয়ে বাড়ির অপর প্রান্তে বদ্ধদ্বার শয়নকক্ষে মাদামের ঘুম কখনোই সে-টোকায় বিচলিত হবে না।

শেষে আমার অবস্থায় বিচলিত হয়ে একজন প্রতিবেশিনী এবং একজন পথচারিণী এগিয়ে আসেন।

'তুমি তো মাদাম আন্তনভের অতিথি, তাই না ? আচ্ছা দাঁড়াও, আমাদের বাগানের ভেতর দিয়ে একটা রাস্তা আছে, সেটা থেকে মাদামের শোবার ঘর দেখা যায়, আমি হাঁক পেড়ে দেখি।' প্রতিবেশিনী অন্তর্হিত হন।

পথচারিণী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আলাপ করতে থাকেন—'তুমি কি আলজেরীয় ?'

অগত্যা পুনরায় আত্মপরিচয় দিতে বাধ্য হই।

'ভারতীয় ? ভারতবর্ষে আমি কখনো যাই নি, তবে আমার স্বামী যুদ্ধের সময় গিয়েছিলো। আমি শুধু আলজেরিয়ায় গিয়েছি। প্রাচ্য বলতে সেখানকার ছবিই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তোমার বয়স কত ? তেইশ ? আহা, এই বয়সেই মারা গিয়েছিলো আমার মেয়ে। ঠিক তোমার মতো দেখতে। হ্যাঁ, অবাক হোয়ো না, প্রায় তোমার মতোই বাদামী রঙ, ঠিক এই মুখের গড়ন, একেবারে তোমার মতন।'

মুগ্ধ নেত্রে আমাকে দেখতে থাকেন ভদ্রমহিলা, এবং সস্নেহে আমার গায়ে হাত বুলাতে থাকেন। ইতোমধ্যে হাঁকাহাঁকিতে মাদাম উঠেছেন। হাসতে হাসতে দরজা খোলেন।

'লজ্জিত, দারুণ লজ্জিত। ঘুমাবো না পণ করা সত্ত্বেও কখন যে ঘুমিয়ে প'ড়েছি। আজ হঠাৎ খেয়াল হয়েছিলো যে সদর দরজা না খুলে শোয়াই ভালো। যা দিনকাল হয়েছে আজকাল। বিশেষতঃ ওপরে তোমার শাড়ি-টাড়ি রয়েছে, কখন কে একটা টেনে নিয়ে যায়।'

এই সুযোগে পথচারিণী মাদামকে প্রশ্ন করেন—'আপনিই মাদাম আন্তনভ ? আপনার বাড়ির একটা ঘর আপনি মিস্ত্রীদের কখনও কখনও ভাড়া দেন না ? কাগজে যেন বিজ্ঞাপন দেখেছি ?'

'হ্যাঁ, দিই বটে, তবে এখন সেটা খালি নেই, ভাড়া হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, ধন্যবাদ।' আবার আমার প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে বিদায় নেন মহিলা।

অতঃপর প্রশ্নের পালা আমার। মাদাম দরজায় একটা ঘন্টি করান নি কেন ?

সশব্দে হেসে ওঠেন মাদাম—'ঘন্টি আছে, তবে কেউ সেটা দেখতে পায় না, কারণ ঘন্টির রঙ দরজার রঙ একই। এই দ্যাখো।'

সবিস্ময়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। একবার দেখিয়ে না দিলে কার সাধ্য যে সে চিনে বার করে। কালো দরজার গায়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে দরজার গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে আছে ছোট বোতামটি। দরজা রঙ করবার সময় কোনো অতিবুদ্ধিমান মিস্ত্রী সযত্নে বোতামটির উপরেও তার বুরুশ বুলিয়ে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যায় তাত্য়ানা ফিরতে তাকে সব বলি। রেড-ইণ্ডিয়ান প্রসঙ্গে খুব হাসে তাত্য়ানা—'তোমাকে তো বলাই হয় নি, তোমাকে দেখার পর থেকে বেশ হতাশ হয়েছে পাড়ার খোকাখুকুরা। তোমার পালক নেই, তূণ নেই, ধনুক-বাণ নেই। তুমি আবার কেমন ইণ্ডিয়ান ? ইণ্ডিয়ান আসবে শুনে ওরা কত কল্পনা ক'রে রেখেছিলো। তোমার সঙ্গে তার একটুও মিল হলো না। টেলিভিশনে রেড-ইণ্ডিয়ান দেখে দেখে এমন হয়েছে যে আমাদের ছেলেমেয়েরা ইণ্ডিয়ান বলতে শুধু তাই বোঝে। তাই তুমি যখন "আসল ইণ্ডিয়ান" বলেছো, তখন ওরা ভেবেছে, "সর্বনাশ, তবে যা শুনেছিলাম তাই ঠিক। তীর-ধনুক না থাকলে কী হবে,

আসল জিনিস তো। কী জানি কখন কোথা থেকে তীর বার করে, হয়তো ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছে, হঠাৎ চ'টে-ম'টে ছুঁড়ে দেয় যদি ? শীগগির পালা, একে না ঘাঁটানোই ভালো।" '

মাদাম আন্তনভ যে-ভাড়া-দেওয়া ঘরটির কথা বলেছিলেন সেটি ছিলো ঢুকতেই বাঁ দিকে। ফলকে লেখা 'প্রবেশ নিষেধ' এবং দরজায় ঝুলন্ত এক বিরাট মরচে-পড়া তালা। প্রায়ই ভেবেছি তাত্য়ানাকে জিজ্ঞাসা করবো ঘরটা কাদের ভাড়া দেওয়া হয়েছে; একদিন এক মজার ঘটনার মধ্য দিয়ে নিজেই জানতে পারলাম।

এক বিকেলে কেউ বাড়ি নেই। লক্ষ্য করলাম উঠানের দড়িতে ঈষৎ-আর্দ্র যেন দুটি শাড়ি ঝুলছে। অবাক হয়ে এগিয়ে গেলাম। কাছে আসতে বুঝলাম শাড়ি নয়, যদিও শাড়ি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ছাপানো রেশম। তখনই অনুমান করলাম ভাড়া-দেওয়া ঘরটির সঙ্গে এই রেশমের কোনো যোগ আছে। সম্ভবতঃ রেশম হাতে ছাপানোর জন্য কোনো কুটিরশিল্পী ভাড়া নিয়েছে। মনে মনে কাপড়-দুটির ছাপের তারিফ করছি, এমন সময়ে চমকে উঠলাম ভারী পুরুষকণ্ঠের সম্ভাষণ শুনে।

'শুভ দিন!'

অবাক হয়ে পিছন ফিরে দেখি দুজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক কৌতূহলী দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সম্ভাষণ-বিনিময় করলাম।

'আমাদের কাপড় পছন্দ হয় ?'

'হ্যাঁ, কাপড়ের তারিফই করছিলাম।'

'অনেকটা আপনার পরনের কাপড়ের মতো। তাই না ?'

'তাই তো দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।'

'আপনি তো হিন্দু, তাই না ? আপনার পোশাক দেখে তাই মনে হয়।'

থেমে থেমে জানালাম, 'হ্যাঁ, আমি হিন্দু বটে, তবে সেটা আমার প্রথম পরিচয় নয়। প্রথম পরিচয়ে আমি ভারতীয়। "হিন্দু" হলো ধর্মের বিশেষণ, আর "ভারতীয়" দেশের। আমি হিন্দু না হয়ে ভারতবর্ষের খৃষ্টান বা মুসলমান মেয়ে হতে পারতাম, আমার শাড়ি দেখে আপনারা কিছুই বুঝতে পারতেন না, কারণ সবাই শাড়ি পরে।'

ভদ্রলোক দুজন লজ্জিত হলেন।

'মাপ করবেন, মাপ করবেন। এই "অ্যাঁদু" আর "অ্যাঁদিয়াঁ"-তে বড় গুলিয়ে যায়। আমরা শেষেরটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম। সংজ্ঞার্থ-দুটির পার্থক্য আমাদের অজানা নয়।'

আসলে ফরাসী দেশে indien বা অ্যাঁদিয়াঁ (স্ত্রীলিঙ্গে indienne বা অ্যাঁদিয়েন) বলতে সর্বপ্রথমে রেড ইণ্ডিয়ানই বোঝায়। প্যারিসের বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিষয়ক প্রদর্শনাগারে সর্বত্র এই ব্যবহার লক্ষ্য ক'রে ক্ষুব্ধ হয়েছি। ভারতীয় বোঝাতে তারা সাধারণতঃ ব্যবহার করে hindou শব্দটি, এবং এই অশুদ্ধ ব্যবহার শিক্ষিতদের মধ্যেও বহুপ্রচলিত। একাধিক জায়গায়

আমাকে বোঝাতে হয়েছে যে সব indien-ই hindou নয়। তাতয়ানা বলে শব্দ-দুটির এই বিভ্রান্তিকর ব্যবহার নাকি ১৯৪৭ সালের পর থেকে কমেছে এবং ভারতীয় বোঝাতে indien শব্দটির প্রয়োগ ক্রমশঃ বাড়ছে ; তরুণেরা নাকি এ ধরণের ভুল করে না।[১]

এদিকে মঁসিয়ে-যুগল বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে তাকিয়েই আছেন।

'মাপ করবেন। আমরা এরকমভাবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি কেন জানেন ? এত কাছ থেকে অ্যাঁদিয়েন কখনো দেখি নি ব'লে। ভারতীয় পুরুষ অবশ্য দেখেছি, কিন্তু ভারতীয় নারী দেখেছি খুব দূর থেকে, বা ছবিতে বা ফিল্মে। আজ এইরকম চোখের সামনে বাস্তব রূপায়ণ...'

লজ্জায় কথা শেষ করতে পারেন না। আমি হেসে অবস্থাটা হাল্কা করার চেষ্টা করি। তাঁরা আমাকে আহ্বান জানান—'আসুন না, আমাদের কাজের ঘরটা দেখে যান না। আমাদের সামান্য আতলিয়র (অর্থাৎ স্টুডিও) ধন্য হোক।'

অগত্যা প্রবেশ করি, কিন্তু দরজার কাছেই থাকি।

'এই দেখুন আমাদের সব রঙ। ঘরটার ছিরি দেখেছেন ? বড্ড অগোছালো ! নারীর কল্যাণ-হস্তের প্রয়োজন ! কী বলুন ?'

মনে মনে ভাবি সেয়ানা আছেন মঁসিয়েদ্বয়। তাঁরা ব'লে যেতে থাকেন—'আপনার মতো দয়াশীলা কেউ যদি সাহায্য করতেন, কত সুষ্ঠুভাবে করা যেতো শিল্পচর্চা।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা কতদিন যাবৎ কাপড় ছাপানোর কাজ করছেন ?'

একজন বলেন, 'কাজটা আমারই প্রধানতঃ। আর ইনি আমার পার্টনার। এই কাজ আমি করছি মাত্র বছর-দুয়েক। এর আগে আমি আইনব্যবসায়ী ছিলাম, কিন্তু সে-পেশা ভালো লাগতো না। তাই ছেড়ে দিলাম। তারও আগে আমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম। আচ্ছা, আপনি নিশ্চয় ইংরেজী জানেন ?'

ভদ্রলোকের পেশা পরিবর্তনে চমৎকৃত হয়ে জবাব দিলাম, 'হ্যাঁ, জানি বৈকি। আমি ইংরেজীরই ছাত্রী। তিন বছর অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করতে হয়েছে, দেশে ফিরে যাবার আগে প্যারিসে বেড়াতে এসেছি।'

'অক্সফোর্ডে !'

নামটা মন্ত্রের মতো কাজ করে ! মুগ্ধ হন দুজনেই।

'তবে সেখানেই কি...'

'হ্যাঁ, সেখানেই মাদাম আন্তনভের মেয়ের সঙ্গে আলাপ এবং সে-সূত্রেই এই বাড়িতে থাকা।'

এবার শিল্পিদ্বয়ের নেতা সলজ্জকণ্ঠে ইংরেজীতে কথা বলতে শুরু করেন।

'ইংরেজী আমিও একটু একটু বলতে পারি। এই দেখুন না। তবে ছাত্রবয়সে আরও ভালো পারতাম।'

'না না, কী বলেন, আপনি তো চমৎকার ইংরেজী বলেন দেখছি।'

'আপনার মতো কি আর ভালো! আপনারা তো বাড়িতে ইংরেজীতেই কথা বলেন, নয় কি?'

'না না, ইংরেজী আমরা স্কুলে শিখি, শিখতে বাধ্য হই। বাড়িতে আমরা মাতৃভাষাতে কথা বলি। আমার মাতৃভাষা বাংলা। ইংরেজী আমাকেও কষ্ট ক'রে শিখতে হয়েছে।' (আমাদের দেশের ড্যাডি-মামি-ওয়ালাদের কথা অবশ্যই কিছু ফাঁস করলাম না, সেসব লজ্জার কথা বলতে যাবো নাকি বিদেশীদের কাছে?)

'আপনি তবে বাঙালী?'—ওঁদের চোখ থেকে আরও আনন্দ, আরও বিস্ময় ঠিকরে পড়তে থাকে—'বাংলাদেশ সম্বন্ধে শুনেছি কত গল্প, কত বর্ণনা। একজন বাঙালী মহিলার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হলো, এ আমাদের অসীম সৌভাগ্য। আচ্ছা, আপনি *বাংলাদেশের রাত্রি* নামে একটা ফরাসী উপন্যাস পড়েছেন কি?'[২]

জানাতে বাধ্য হই যে সে-সৌভাগ্য আমার হয় নি। যিনি কথা বলছিলেন তিনি জানান, 'বইটার কেন্দ্রিক সমস্যা হলো একজন ফরাসীর সঙ্গে এক বাঙালী মেয়ের প্রেম। সমাজের দিক থেকে আসছে প্রচণ্ড বাধা। ইয়োরোপীয়ের সঙ্গে বিবাহ মেয়েটির সমাজ অনুমোদন করতে চাইছে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন, এ চিত্র কি যথাযথ? ইয়োরোপীয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য বিবাহে বাংলার সমাজের এটাই কি প্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া?'

এ প্রশ্ন তো সহজ নয়। জানাই যে এর কোনো একটিমাত্র জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। উক্ত নায়িকা সমাজের কোন্ স্তরের অন্তর্ভুক্ত, ঘটনার স্থান ও কাল কোথায়, এসবের উপর উত্তর নির্ভর করে; তবে ইন্দো-ইয়োরোপীয় বিবাহ মধ্যে মধ্যে ঘটে এবং শিক্ষিত সমাজে গৃহীত হয় ব'লেই জানি। হঠাৎ প্রশ্ন আসে—'আচ্ছা, আপনি হলে কী করতেন? আপনি নিজে কি ইয়োরোপীয়কে বিয়ে করতেন?'

'বিয়াঁ স্যুর! প্রেমে পড়লে নিশ্চয় করতাম। শুধু ইয়োরোপীয় কেন, যে-কোনো দেশের লোককেই করতাম!'

সপ্রশংস নেত্রে তাকান তাঁরা, আমার উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তুষ্ট হয়ে গুঞ্জরণ করেন—'মাপ করবেন এই অশোভন কৌতূহল, কিন্তু আপনাকে কী ব'লে ডাকবো, মাদাম না মাদমোয়াজেল, মানে আপনি কি বিবাহিতা?'

'না, আমি বিবাহিতা নই, আমাকে মাদমোয়াজেল ব'লেই ডাকবেন।'

'আচ্ছা মাদমোয়াজেল, আপনি যে বললেন ইয়োরোপীয়কে বিয়ে করতে আপনার আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি কি ধর্মান্তর গ্রহণ করতে রাজি? আপনার স্বামী খৃষ্টান হলে আপনি কী করতেন?'

'স্বামীর ধর্ম স্বামীর থাকতো, আমার ধর্ম আমার থাকতো, রেজিস্ট্রি বিয়ে করতাম। আমার ধর্ম আমি ত্যাগ করতাম না।'

'আচ্ছা ধরুন আপনার স্বামী রোমান ক্যাথলিক। সে মনে করে তার পন্থাই একমাত্র সত্য পন্থা। সে চায় তার স্ত্রীও তার সঙ্গে একধর্মাবলম্বিনী হোক। নিদেনপক্ষে সন্তানকে সেভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে। সে-ক্ষেত্রে আপনি কী করতেন ?'

'সেরকম একদেশদর্শী লোকের প্রেমেই আমি পড়তাম না! তা ছাড়া সন্তানদের শৈশব থেকে কোনো এক বিশেষ মন্ত্রে দীক্ষিত না করাই প্রশস্ত। সব পন্থা সম্বন্ধে জানতে পড়তে দিলে নিজেরাই বিচার ক'রে নিতে পারবে। ভগবান যদি থাকেন, আপনারা নিশ্চয় মানবেন যে তিনি এক। আজকের দিনে এ প্রসঙ্গ নিয়ে ঝগড়া অর্থহীন। সৎ জীবনযাত্রার নীতিসমূহ সব দেশেই এক ; সৎ জীবনই সৎ ধর্ম, তাই নয় কি ?'

'ঠিক, ঠিক, খাঁটি কথা। কিন্তু মাদমোয়াজেল, এক মিনিট। দাঁড়ান দেখি। আমার যেন চিন্তা একটু গুলিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম। মাদমোয়াজেল, আপনার কী মনে হয়—ধর্ম বড়, না প্রেম বড় ?'

'দেখুন মঁসিয়ে, আমার জীবনে সেরকম কোনো দ্বন্দ্ব নেই, কারণ আমার আগের উক্তি থেকেই বুঝতে পারছেন যে ধর্ম বলতে আমি কোনো একপেশে বিশ্বাসকে বুঝি না, বুঝি সৎ জীবন। প্রেম সৎ জীবনেরই অংশ, সুতরাং দ্বন্দ্ব কোথায় ? সংকীর্ণ ধর্মের চাইতে প্রেম নিশ্চয়ই বড়। ধর্ম আর প্রেম, দুয়ের সংজ্ঞার্থ যথার্থভাবে বুঝলে বিরোধ থাকা উচিত নয় মনে করি।'

'আপনি যথার্থই উদার, মাদমোয়াজেল। ফরাসীরা আপনার অভিমত শুনে কী বলবে জানি না, কিন্তু আপনি আমাদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।'

অবাক হয়ে শুধাই, 'আপনারা ফরাসী নন ? তবে কি আরমানী ?'

'না, মাদমোয়াজেল। আমরা রুমানী। রুমানিয়া আমাদের মাতৃভূমি। আমরা উদ্বাস্তু, এমিগ্রে। আমাদের শরীরে বেদের রক্ত আছে। আমাদের কালো চুল এবং চোখ লক্ষ্য করুন। বোধ করি আমাদের পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষ থেকেই এসেছিলেন।'

তাঁদের চুল এবং চোখের রঙ আগেই লক্ষ্য করেছিলাম। সহানুভূতির স্বরে বললাম, 'আমার পূর্বপুরুষেরাও বাস্তুত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।' এবং ইংরেজী ফরাসী মিলিয়ে দেশ বিভাগের একটা বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলাম।

ঝনাৎ শব্দে দরজা খুলে মাদাম আন্তনভ বাড়ি ফিরলেন।

'শুভ দিন, শুভ দিন, মহাশয়গণ। আমাদের অতিথির সঙ্গে গল্প হচ্ছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ মাদাম, মাদমোয়াজেলের সঙ্গে আলাপ ক'রে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। ওঁকে বলবেন, আবার এসে আমাদের সঙ্গে গল্প করতে।'

'নিশ্চয় বলবো। কিন্তু আপনাদের কাজ কেমন চলছে, কোনো অসুবিধা নেই তো ? বেশ বেশ।'

আবার তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে আমার কোনোই আপত্তি ছিলো না, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁদের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় নি।

ছয়

প্রতিবেশী আরমানী পরিবার মিনাস-দের সঙ্গে আস্তনভদের বিশেষ যোগাযোগ ছিলো। পাশাপাশি বাড়ি এবং উঠোন। মাঝে শুধু বেড়া। আমাদের এদিকে অযত্নবর্ধিত ঘাস ; ওঁদের ওদিকে ছিমছাম তরিতরকারির বাগান, মাচা, চারায় জল দেবার জন্য পাইপ, আরও কত কী। বাগানের এক কোণে একটি অস্থায়ী তাঁবু, বাচ্চাদের নিদাঘপ্রমোদের জন্য।

মিনাস-রা যৌথ পরিবার। এখন যাঁরা বুড়ো-বুড়ী তাঁরা এসেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে, কোনোমতে মাথা গুঁজবার জন্য একটা একতলা বাড়ি তুলে নিয়েছিলেন, আর বাগানে লাগিয়েছিলেন শশাটা বেগুনটা। তাঁদের একমাত্র সন্তান আজ জোয়ান হয়েছে, শহরে তার মস্ত জুতোর দোকান। একতলার উপরে ছেলে দোতলা তুলেছে, আর তার সঙ্গে এনেছে আধুনিক পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার সমস্ত সরঞ্জাম—গাড়ি, রেফ্রিজরেটর, বৈদ্যুতিক চুল্লী এবং অন্যান্য-যন্ত্র-সংবলিত রান্নাঘর। ছেলের বিয়ে বাপই দিয়েছিলেন যথাসময়ে। ঘরে এনেছিলেন টুকটুকে বৌ। আজ আর কোনো দুঃখ নেই তাঁর, নেই কোনো দৈন্য, কোনো ক্লেশ। স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বৌ, নাতিনাতনীদের নিয়ে জীবনের সায়াহ্নে এখন শুধু অবসরযাপন। সারা সকাল বাগানে খুটখাট করেন বুড়ো মিনাস। মাটি খোঁড়েন, জল ঢালেন, মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করেন তাঁর চারাদের বৃদ্ধি, মোটা মোটা গোল গোল লেটুসদের বাহার দেখে নিজের অজান্তে হেসে ফেলেন, সযত্নে হাত দিয়ে শিশির ঝেড়ে দেন। কখনও বা তৈরি করেন শখের ডিঙিনৌকা, নাতিনাতনীরা নৌকা বাইবে বায়না তুলেছে। মাদাম আস্তনভের সঙ্গে দেখা হলেই একগাল হাসি। কখনও হয় সুখদুঃখের কথা, কখনও বা বেড়ার উপর হাত বাড়িয়ে মাদামের দিকে এগিয়ে দেন একথোলো তাজা লেটুস। কখনও লক্ষ্য করি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে অথচ জোর দিয়ে আঙুল নেড়ে নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছেন। ভাষা আরমানী, বুঝতাম না কিছুই, তবে এটুকু বোঝা যেতো যে কোনো-একটা ব্যাপারে তর্কের এদিক-ওদিক সব গুছিয়ে ধাপে ধাপে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন। ওঁদের কথাবার্তা থেকে প্রায়শঃ ব্যবহৃত দুটি শব্দ মনে আছে: 'আইও' আর 'দা'। বৃদ্ধ বিস্মিত মুখে হয়তো বলছেন, 'আইও !' বা তাঁর নাতিদীর্ঘ কোনো ভাষণের পর মাদাম গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলছেন, 'দা, দা।' 'দা' মানে যতদূর মনে আছে 'হ্যাঁ'।[১] 'আইও'-র ঠিক মানেটি আমার আর মনে নেই, তবে সেটিও অনুরূপ কোনো অব্যয়-শব্দ।

আমাকে দেখে বৃদ্ধ মিনাস যে অবাক হয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। মাদাম আবার তাঁকে ইন্দো-ইয়োরোপীয় পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে জ্ঞানদান করতে লাগলেন। মিনাস একবার

তাঁর কথা শোনেন, আর একবার তাকান আমার দিকে, আর হাসিমুখে বলেন, 'দা, দা।' আরমানীরা তাদের ইন্দো-ইয়োরোপীয় উৎস সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন। সেই উৎসের 'ইন্দো' অংশটির একজন জলজ্যান্ত আধুনিক প্রতিনিধিকে দেখে পুলকিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

বুড়ী মিনাস ছিলেন রোগাটে। এপ্রন প'রে সারাটি সকাল তিনিও সাহায্য করতেন স্বামীকে। এসব তাঁদের শখের কাজ, সময় কাটানোর জন্যে মাত্র। বিকেলের দিকে কর্তা-সহ রোয়াকে ব'সে নাতিনাতনীদের সঙ্গে গল্প করতেন। সারা দিনই থেকে থেকে বাগান থেকে হাঁক পাড়তেন পুত্রবধূর উদ্দেশে : 'এলি—জ় ! এলি—জ় !' অমনি দোতলার বারান্দায় এলিজ়ের আবির্ভাব : 'কী, মা ?'

এলিজ় মেয়েটি ছিলো ভারী মিষ্টি। বছর আটাশ-উনত্রিশ বয়স। স্বাস্থ্যে ভরপুর নিটোল দেহ, গৌর পুষ্ট বাহু-দুটি কার্নিসে ভর দিয়ে এসে দাঁড়াতো। যতদিন দেখেছি সর্বদাই পরনে বগল-কাটা সূতী ফ্রক, হয়তো ওর নিজের হাতেই বানানো, কাজকর্মের সময় কোমরে আঁট ক'রে বাঁধা ধোপদুরস্ত সাদা এপ্রন। কুচকুচে কালো চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া, ঘাড়ের উপর গুচ্ছ গুচ্ছ নেমে এসেছে। টান ক'রে ফিতে দিয়ে কখনও কখনও বেঁধে রাখতো, কিন্তু কপালে, কানের কাছে অবাধ্য অলক উড়তে থাকতো। ডাগর কালো চোখ-দুটি আরও বিস্ফারিত ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। যতবার দেখতাম মনে মনে আওড়াতে বাধ্য হতাম :

মুখখানি মিষ্টি রে
চোখ দুটি ভোমরা
ভাবকদমের—ভরা
রূপ দ্যাখো তোমরা।

তাত্য়ানার কাছে শুনেছিলাম কোনো আরমানী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সমাধিক্ষেত্রে কিশোরী এলিজ়কে দেখেছিলেন প্রৌঢ় মিনাস। তখনই খোঁজখবর করেছিলেন কার মেয়ে ইত্যাদি। পরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ছেলেকে, 'সকালে গোরস্থানে কালো পোশাকে যে-মেয়েটিকে দেখেছিলে, পছন্দ হয় ?' ছেলে জ়োজ়োর আপত্তি ছিলো না। অতএব শুভস্য শীঘ্রম্। বাপ-বেটা উভয়েই যে যথার্থ পরিণামদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কারণ এলিজ়ের মতো কল্যাণী গৃহলক্ষ্মী খুব কমই হয়। উপরন্তু এলিজ় ছিলো প্রকৃত বুদ্ধিমতী, তার চোখমুখ থেকে নারীসুলভ উপলব্ধির দ্যুতি ঠিকরে পড়তো। চোখ তুলে সোজা চাইতো, উত্তর দিতো আগ্রহ-সহকারে ; তার ব্যবহারে মাধুর্য এবং ছন্দ ছিলো, কিন্তু ছিলো না অহেতুক সংকোচ বা আড়ষ্টতা। সংসারের সব কাজ সে নিজেই করতো, ঝি-চাকরের বালাই ছিলো না। খোলা সিঁড়িটা দিয়ে সারা দিন তরতর ক'রে উপর-নীচ করতো। সন্ধ্যায় ফিটফাট হয়ে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতো তাদের দ্যশভো গাড়িটি ক'রে।

স্বামী জোজো ছিলো মজাদার মানুষ। কৌতুকপ্রিয়। সযত্নে বাগিয়েছিলো গোঁফজোড়াটি। আমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে বেড়ার ওপাশ থেকেই অনর্গল চালাতো ঠাট্টা-তামাশা। ছুটির দিন দুপুরের দিকে হয়তো খুব রোদ উঠেছে, দেখি মঁসিয়ে জোজোর উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, বাগানে জল দেবার পাইপটি নিয়ে দিব্যি স্নান হচ্ছে।

'ও মঁসিয়ে, আপনাদের স্নানের ঘরে কি ধারাযন্ত্র নেই?'

'আছে বৈকি। কিন্তু এই উদার রোদ ফেলে ঠাণ্ডা বাথরুমে কে যায়? প্রকৃতির বুকে স্নানই শ্রেষ্ঠ।'

একমত না হয়ে উপায় নেই। তৎক্ষণাৎ—

'আপনিও আসুন না, মাদমোয়াজেল। যোগদান করুন।'

'এত বেশী মস্করা ভালো নয়, মঁসিয়ে,' চোখ পাকিয়ে বলি আমি।

'ফরাসীতে আমরা বলি "তাকিনে" মানেই "এইমে", ঠাট্টা করতে পারাই প্রীতির লক্ষণ,' নিরুদ্বেগে জবাব দেয় জোজো মিনাস। বারান্দায় এলিজ় খিলখিল ক'রে হেসে ওঠে।

তাত্য়ানাদের টেলিফোনটিতে একটি লুক্কায়িত কব্জা ছিলো, সেটিকে না টিপলে সংযোগস্থাপন হতো না। অথচ সেটি ছিলো এতই গোপন যে বাইরের কারও বুঝবার উপায় ছিলো না, অনেকটা তাদের দরজার ঘণ্টির বোতামের মতোই। একদিন দুপুরে কেউ বাড়ি নেই, টেলিফোন বেজে উঠলো। আমি ধরেছি এবং সম্বোধন করেছি, অপর পক্ষও তথৈবচ, কিন্তু বুঝলাম কানেক্শন হচ্ছে না। অগত্যা ফোন ছেড়ে দিতে হলো। যিনি ফোন করেছিলেন তিনি আরও দুবার কল্ করলেন। আমি যথারীতি উত্তর দিলাম, কিন্তু কানেক্শন হলো না।

উঠানে এসে দেখি বেড়ার ওধারে বুড়ী মিনাস কাজ করছেন। ব্যাপারটা তাঁকে বললাম। তিনি ছিলেন আমার সামনে বিশেষ লজ্জাশীলা। আমাকে সোজাসুজি কোনো জবাব না দিয়ে তিনি ডাকতে শুরু করলেন, 'এলিজ়, এলিজ়!'

বারান্দায় এলিজ়ের আবির্ভাব। এলিজ়কে আবার বললাম। সে বললো—'সে কী! ফোন তুলে হ্যালো বললেই তো চলে। কী আশ্চর্য! আচ্ছা, আবার যদি বাজে, আমি দৌড়ে আসবো। কিন্তু জ়িজ়ি-বুদাকে সামলাবে কে?'

'ভয় নেই, জ়িজ়ি-বুদা রান্নাঘরে বন্ধ আছে, কিচ্ছু করবে না।'

ফোন অবশ্য আর আসে নি, কিন্তু এলিজ়ের সঙ্গে সেই আমার প্রত্যক্ষ সংলাপ। সন্ধ্যায় তাত্য়ানা আসতে তাকে সব বললাম। প্রথমে তাত্য়ানাও অবাক।

'কব্জা? কই আমাদের ফোনে তো সেরকম কিছু নেই—'

'নয়তো কানেক্শন হলো না কেন শুনি? তুমি বলতে চাও ত্রুটি ও তরফ থেকেই? অপর পার্টিই কোনো বোতাম টিপতে ভুল করেছিলেন?'

হঠাৎ মনে পড়ে তাত্য়ানার। হ্যাঁ, আছে বৈকি। টেলিফোনটার নীচে। টেলিফোন আর টেবিলের মাঝে সরু ফাঁকটিতে আঙুল খুঁচিয়ে সেটাকে ক্লিক্ করতে হয়। এত অভ্যাস হয়ে গেছে যে সেটা যে অসাধারণ তাও মনে থাকে না।

শীগগিরই একদিন এলিজ়রা আমাদের সন্ধ্যায় কফির নিমন্ত্রণ করলো। সেদিনই দেখলাম কী পরিপাটি তার সংসার, কী গুছানো তার রান্নাঘরটি, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি কী তার যত্ন। ছোট্ট একটা পানপাত্রে এলিজ় আমাকে একফোঁটা পানীয় দিলো—আরমানী মদ। তাতে মৌরী মৌরী গন্ধ।

'আমি জানি তোমার ভালো লাগবে,' হাত ঘুরিয়ে বলে সে।

কেমন ক'রে তাকে জানাই আমার মনের কথা ?

সাহেব বলেছেন যেতে
পানসুপারি খেতে,
পানের আগায় মৌরীবাটা,
ইস্কাবনের চাবি আঁটা।

টান ক'রে বাঁধা এলিজ়ের চুল, পিছনে ঘোড়ার লেজ স্টাইল। সবই মিলে যাচ্ছে।

চুল-টানা বিবিয়ানা,
সাহেব-বাবুর বৈঠকখানা।

এদিকে জ়োজ়ো উঠে প'ড়ে লেগেছে আমার শাড়ি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে। প্রথমে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য-সহকারে—

'মাদমোয়াজ়েলের পায়ে কি কোনো ক্ষতচিহ্ন-টিহ্ন আছে নাকি ?'

'না তো। কেন বলুন তো ?'

'তবে সর্বদা ঐ লম্বা পোশাকে পা ঢেকে থাকেন কেন ?'[২]

তাত্য়ানা আমার সাহায্যে আসে এবং শাড়ির উপর একটি ছোটখাট জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেয়। শাড়ি যে দর্জির তৈরি কোনো পোশাক নয়, বস্ত্রখণ্ড মাত্র, তা জেনে জ়োজ়ো-এলিজ় উভয়েই চমৎকৃত। আমাকে ঘুরে ঘুরে দ্যাখে। থেকে থেকে অস্ফুট গুঞ্জন করে। অবশেষে জ়োজ়ো মন স্থির ক'রে ফ্যালে—'বুঝলে এলিজ়, তোমাকে একদিন শাড়ি পরতে হবে। তুমি পরবে মাদমোয়াজ়েলের একটা শাড়ি, আর ওঁকে দেবে তোমার একটা ফ্রক।'

আমি তো সর্বদাই রাজি। কিন্তু জীবনের আরও অন্যান্য মজার পরিকল্পনার মতো এ পরিকল্পনাটাও আমার হ্রস্ব ম্যদঁ-বাসের মধ্যে বাস্তবে রূপায়িত হয়ে উঠবার সুযোগ পায় নি।

এক বিকালে জ়োজ়ো আমাদের নিয়ে গেলো ভার্সাই-এর প্রাসাদে। দিনটা রোদে রোদে একেবারে তেতে উঠেছিলো ; ভার্সাই-এর প্রাসাদে আর উদ্যানে ভিড় করেছিলো ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা। ইয়োরোপের যাবতীয় দেশের লোক এসেছিলো দলে দলে। আমাকে একসঙ্গে

এত অসংখ্য কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হলো যে আমার নিজের বেড়ানোর আনন্দই গেলো প্রায় শুকিয়ে। মানতে বাধ্য হলাম যে জনারণ্যের কৌতূহল স্বাভাবিক, কিন্তু আমার পক্ষে সেই শতমুখ কৌতূহল নিতান্ত অস্বস্তিকর হয়ে পড়লো। নিজেই চিড়িয়া হয়ে পড়লে চিড়িয়াখানা দেখবার সুখটি আর থাকে না। মনে মনে প্রার্থনা করি, ভগবান, এই জনারণ্যে মিশিয়ে দাও না আমাকে, দর্শক হতে চাই, দ্রষ্টব্য নয়। কিন্তু সে-প্রার্থনা বিফল হলো : শাড়ি এবং বাদামী চামড়া এই দ্বৈত পতাকার মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থেকে আমি জনগণের মুখে অপার বিস্ময় এবং আমার সমভিব্যাহারী ও সমভিব্যাহারিণীর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটিয়ে তুলতে লাগলাম।[৩]

ভার্সাই-উদ্যানের ফোয়ারাগুলি আমাকে চমৎকৃত করলো, কিন্তু গাছগুলি দেখে আমি একাধারে হতাশ এবং দুঃখিত হলাম। নিষ্ঠুর হাতে খর্বীকৃত, নির্মম কাঁচিতে ছাঁটা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন বেঁটে বেঁটে আকৃতিমাত্র। বৃক্ষের নিজস্ব সত্তা আর নেই, ডালপালা নিয়ে মনের আনন্দে তাকে বাড়তে দেওয়া হয় নি মোটেই, কাঁচির সাহায্যে শুধু সবুজ রঙের একটি ফর্ম স্থষ্টি করা হয়েছে। যেন স্থাপত্যের অনুকরণ করতে চেয়েছেন উদ্যানশিল্পী। প্যারিসে অন্যত্রও এই অত্যধিক ছাঁটার রীতি লক্ষ্য করেছিলাম ; এমন কি, বলতে নেই, যদিও কথাটা প্রায় ব্ল্যাসফেমির মতো শোনায়, তবুও বলি, শাঁজেলিজে দেখেও আমার মনে অনুরূপ একটা ক্ষোভ হয়েছিলো।

তাত্যানার সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা হতে হতে তর্ক বাধলো। ফরাসী উদ্যান-রীতিতে আর্টের স্থান বেশী, আর ইংরেজরা বেশী পছন্দ করে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বাগান। ফরাসীদের বাগানকে যদি 'উদ্যান' বলি, তবে ইংরেজদের বাগানকে বোধ হয় 'কানন' বলা যায়। 'উদ্যান'—যে-অর্থে দুষ্যন্ত বলেছিলেন, 'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ'। আর 'কানন'—যে-অর্থে আমরা বলি 'নন্দনকানন'। দ্বিতীয় আইডিয়াটা বন-ঘেঁষা।

তাত্যানা অক্সফোর্ডে থাকতে অনেক ইংরেজী কায়দার বাগান দেখেছিলো, কলেজগুলির অভ্যন্তরে তো বটেই, শহরের চার পাশের গ্রামাঞ্চলে অভিজাত পরিবারের অধুনা-অব্যবহৃত সম্পত্তির মধ্যেও একাধিক নিদর্শন ছিলো। কোনো কোনো বাগানে মিশ্র রীতি লক্ষ্য করা যেতো, কারণ ইংলণ্ডের রীতির উপর, বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণী আর রাজারাজড়াদের মধ্যে, ফরাসী প্রভাব অল্প-বিস্তর থাকবেই। বড়লোকদের বাগানে তাই এক দিকে বাড়ন্ত গাছ, স্তবকিত লতা আর ময়ূর, আবার অন্য দিকে কিছু ছাঁটা গাছের সারি একত্র নজরে পড়তো।

তাত্যানা বললো, 'ইংরেজরা গাছকে বড় বাড়তে দেয়। বাগানই যদি করতে হয়, তবে কিছু কাটছাঁট তো করতে হবেই। বাগান আর প্রকৃতি—দুটো তো এক বস্তু নয়। প্রকৃতিকে আপন মনে বাড়তে দাও, হবে জঙ্গল।'

'কী আশ্চর্য, আমি কি অস্বীকার করছি,' বলি আমি, 'প্রকৃতি আর বাগান এই দুয়ের মাঝখানে সীমারেখা টানতেই হবে। বাগান করার উদ্দেশ্য কী? একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে প্রকৃতিকে কিছুটা পোষ মানানোর চেষ্টা। বাগান নিশ্চয়ই মনোরঞ্জক হবে, কিন্তু তা হতে গিয়ে প্রকৃতির সত্তা যেন হারিয়ে না বসে। যে-বাগান বৈশিষ্ট্যপ্রয়াসী তাকে কিছুটা অন্ততঃ তপোবনের ইঙ্গিত তো বহন করতে হবে। অ-কৃপণ অ-ব্যাহত প্রকৃতির ঐশ্বর্য এবং আধ্যাত্মিকতার কিছুটা স্বাদ তো দিতে হবে। আসলে এটা সেই চিরকালের ক্ল্যাসিক-রোম্যান্টিক দ্বন্দ্ব, কতটা রাখতে হবে, কতটা ছাড়তে হবে। এ প্রসঙ্গে ইংরেজ-ফরাসীর মতৈক্য কখনো হতে পারে ভেবেছো? শেক্সপীয়রের রীতি আর রাসীনের রীতি ভিন্ন থাকতেই বাধ্য। জাপানীদের হাতে বাগান আবার ডেকরেটিভ আর্টের চরম সীমায় পৌঁছয়, তারা গাছকে পঙ্গু, বিকলাঙ্গ ক'রে দেয়—'

'তুমি থামো তো,' হেসে ওঠে তাত্য়ানা, 'তুমি তো ইংরেজদের বাগানেও বিমর্ষ হও। যেমন ধরো লন, নিটোল-ছাঁটা মসৃণ সবুজ ভেলভেটের গালিচার মতো লন জিনিসটি ইংরেজ মালীদের একান্ত প্রিয়, কিন্তু তোমার চোখে তো তা-ও "কৃত্রিম" ঠেকে! সেন্ট গ্রেগরিজ় হাউজ়ের বাগানে "ডেইজ়ি-ধ্বংস" রব তুলে তুমি কী কাণ্ডটাই না করেছিলে!'

'কাণ্ড মানে? যথার্থ করেছিলাম, দরকার হলে আবার করবো। যেখানে আমি ঘাসে চলতে সাবধানে পা ফেলি, সাবধানে চেয়ার পাতি যাতে ডেইজ়িরা যথাসাধ্য কম চাপ পায়, সেখানে একজন প্রৌঢ়া মালিনীর চিরস্থায়ী নির্দেশ-মতো এক ছোকরা এসে নির্মম রোলারে সব সমতল ক'রে দেবে?'

জ়োজ়ো আগ্রহী হয়ে ওঠে—'আপনি কী করলেন?'

'গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবাদ পেশ করলাম। চসরের নজির দেখাতে ভুললাম না। চসর ডেইজ়িকে বলেছেন ফুলের রানী। বসন্তের ডেইজ়িখচিত ঘাস যে দেখেছে তার বোঝা উচিত কেন তিনি এ সম্বোধন করেছিলেন। ভদ্রলোক মিটিমিটি হেসে শুনলেন, খানিকটা অবাক হলেন বৈকি। সেটা ছিলো হাউজ়ের সমবেত এক লাঞ্চের আসর। সবাই বিস্মিত। মিসেস জ়ার্নভকে আগেই ব'লে রেখেছিলাম যে আমি প্রসঙ্গটা তুলবো। তিনিও হাসছেন। লাঞ্চের শেষে বাগানের মালিনীর সঙ্গে মোলাকাত। চেয়ারম্যান অত্যন্ত বিনীত কণ্ঠে বললেন, "মিসেস বার্ন, হাউজ়ের একজন বাসিন্দা আপত্তি করছে তথাকথিত ডেইজ়ি-ধ্বংসের বিরুদ্ধে। ইংরেজ কবিরাও নাকি থাকলে আপত্তি করতেন। বিশেষতঃ মধ্যযুগের একজন কবি নাকি ডেইজ়িকে ফুলের রানী ব'লে ডেকে ফেলেছেন। এরকম অবস্থায় কী করা যায় বলুন তো?"—

'মহিলা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন, তার পর বললেন, "ডেইজ়িকে কবিরা ফুলের স্থান দিয়েছেন? আমরা তো ওকে আগাছার পর্যায়ে ফেলি।" সেখানেই তো গোলমাল! অথচ সমস্যার একটা সমাধান চাই। ক্রমাগত বাড়তে দিলে ডেইজ়িরা তো মাঠ

একেবারে ছেয়ে ফেলবে। এক হাত লম্বা ঘাসের মধ্যে নক্ষত্রের মতো ফুটে থাকবে তাদের মুখগুলি। বাগান আর বাড়ির বাগান থাকবে না, হয়ে উঠবে flowery mead। এ চারা শখের গোলাপ নয়, অযত্নে বেড়ে ওঠে। তার কেয়ারি লাগে না, তাই তো মালীদের মতে সে আগাছা।

'অগত্যা ঠিক হলো, ডেইজ়িদের সপ্তাহখানেক ক'রে ক'রে রেহাই দেওয়া হবে। তত দিনে তারা যা বাড়বার বাড়বে, মাঠের শোভাবর্ধন করবে এবং দর্শকদের মুগ্ধ করবে, তার পর ঘাস মুড়িয়ে দেওয়া হবে। পরদিন থেকে আবার গজাতে শুরু করবে তারা। এ ব্যবস্থা ভালোই চললো। ডেইজ়িরা অবাধ্য বন্য চারা, তাদের বেশ কঠিন প্রাণ। এমনিতে তাদের উপর দিয়ে আলতোভাবে হেঁটে গেলে তারা মরে না, নত হয়ে আবার উঠে পড়ে। ঘাস মোড়ানোর পরও তাদের শিকড় অক্ষত থাকে। অনেক সময় দেখেছি সকালে রোলার চালানো হয়েছে, অথচ দুপুরের দিকে আবার সাদা সাদা বিন্দু উঁকি মারছে।'

তাত্য়ানা বললো—'জানো জ়োজ়ো, পরীক্ষার আগে কেতকী অধিকাংশ দিন বাগানেই পড়া তৈরি করতো। ঐ ডেইজ়িদের দেখে দেখে "অনুপ্রেরণা" সংগ্রহ করতো। শেষ ক' দিনের জন্য মিসেস জ়ার্নভ নির্দেশ জারি ক'রে দিলেন কেতকীর পরীক্ষা শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ঘাস কাটা হবে না। কেতকী আবার সে-বাগানের উপর একটা কবিতা লিখে আগেভাগে মিলিৎসাকে অনুবাদ ক'রে শুনিয়ে রেখেছে কিনা, কাজেই মিলিৎসার মনটি তখন গ'লে আছে।'[১]

গল্পে গল্পে সেদিন ফিরতে সন্ধ্যে ঘনিয়ে গেলো। ফেরার পর জ়োজ়ো বললো, 'এখন ছাড়া পাচ্ছো না। চলো আমরা এলিজ়কে তুলে নিই আর কেতকীকে প্যারিসের বিমানঘাঁটি দেখিয়ে আনি।'

দ্যগল-কর্তৃক উদ্বোধিত প্যারিসের নবনির্মিত বিমানবন্দর সত্যিই দেখবার মতো। প্যারিস শহরেরই একটা ছোটখাট নমুনা যেন উঠিয়ে এনে কাচের ঘরে জীইয়ে রাখা হয়েছে। সব বিমানঘাঁটিতেই কিছু কিছু দোকান থাকে, কিন্তু এখানে যেন শহরের সব পসরারই একটা বিচিত্র প্রদর্শনী। এমন কি আধুনিক চিত্রকলার নিদর্শন পর্যন্ত সাজানো আছে, অবশ্য বিক্রির জন্যে নয়।

অবশেষে জ়োজ়ো বললো, 'চলো, বিরাট বারান্দা থেকে বিমানের আসা-যাওয়া দেখা যাক।' সেখানে যেতে হলে একটি ছোট গেটে দক্ষিণা দিতে হয়। গেটে কিন্তু কেউ নেই। জ়োজ়োরা খুব খুশী। গেট ডিঙিয়ে এগিয়ে যাই। পর্যটকদের ভিড় আছে, কিন্তু কোনো বিমানের চিহ্নমাত্র নেই। সর্বত্র নির্জন, কোনো আলো নেই। অন্ধকারে সব থমথম করছে। অনেকক্ষণ পরেও কোনো প্রাণের চিহ্ন এলো না। 'বেশ হয়েছে,' ব'লে উঠলো তাত্য়ানা, 'পয়সা দিতে হয় নি। এরোপ্লেন নেই, এয়ার হস্টেসরা ঘোরাফেরা করছে না। জনশূন্য পরিত্যক্ত এ আবার কেমন এয়ারপোর্ট?'

তাত্‌য়ানার গলা কেউ কেউ শুনতে পেয়েছিলো, মজা পেয়ে ফিরে তাকালো। তার পর শুনলাম। কী? না ধর্মঘট। সেজন্যেই দরজায় পয়সা নেবার জন্য কেউ ছিলো না। প্যারিসে কোনো প্লেন আর নামছে না, গতি বদলে দেওয়া হচ্ছে, আর এখান থেকে ছাড়ছে না যে তা বলাই বাহুল্য।

ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে জ়োজ়ো—'খবরের কাগজ না পড়ার ফল!'

আমি কিন্তু অবাক হই নি। কয়েক দিন থেকেই প্যারিসে নানাবিধ হরতাল লক্ষ্য করেছি। একদিন হলো মেট্রোর হরতাল। আর একদিন লুভ্‌র্-এর দরজা থেকে ফেরত এসেছি; বিমর্ষ এক দারোয়ান জ্ঞাপন করলে, 'লা গ্রেভ,' অর্থাৎ ধর্মঘট। আরও একদিন, দেশের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি ডাকে দেবো, মেয়রী দিসি মেট্রো স্টপের কাছে একজন পথচারীকে নিকটতম ডাকঘর কোথায় প্রশ্ন করেছি; সে পেলো মজা। আমার প্রশ্ন বিশেষ গ্রাহ্য না ক'রে সে জানতে চাইলো আমি ইংরেজী জানি কিনা। তার পর নিজের ইংরেজীজ্ঞান ফলাবার জন্য হাত নেড়ে বললো, 'নো লেত্‌র্, নো পোস্ত্‌ তুদে। লা গ্রেভ, স্ট্রাইক, ইউ সী।'

আমি ব্যাকুলভাবে শুধালাম, 'ডাকঘর বন্ধ? ডাকটিকিট পাওয়া যাবে না?'

সে তার একটি হাত অপর হাতের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে বললো, 'পোস্ত্‌ শাত্‌, ক্লোজ়্‌দ্‌, লাইক দিস।'

আমি কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না। সেদিনটা কোনো ধর্মঘট ছিলো না সকালে তাত্‌য়ানার কাছে তাই শুনেছিলাম। রাস্তার মোড়ে খবরের কাগজ আর নানান পত্রপত্রিকার স্টল ছিলো। তার প্রৌঢ়া দোকানদারনীকে জিজ্ঞাসা করলাম এবং তাঁর নির্দেশ অনুসারে অনায়াসেই ডাকঘর বার করলাম। দিব্যি খোলা, তবে কোনো খদ্দের নজরে পড়লো না। যে-মহিলা ডাকটিকিট বেচলেন তাঁকে বিশেষ প্রসন্ন মনে হলো না; ধর্মঘটের কিনারায় এসে পড়েছেন আর কি, পারলেই ঝাঁপ দেন।

জ়োজ়োকে সান্ত্বনা দিলাম। ঠাট্টা ক'রে বললাম—'ভালোই হলো, মঁসিয়ে। ফ্রান্সের একটা অভ্যন্তরীণ চিত্র পেলাম। কর্মীদের অসন্তোষ, বিক্ষোভ, হরতাল.. দ্যগলের রাজত্বে আপনারা কিরকম সুখে আছেন প্রত্যক্ষ জেনে গেলাম।'

'বটে?'

'না না, চটবার কিছুই নেই। হরতালের কথাই হচ্ছে। আমি হলাম কলকাতার লোক। সে-শহরে বছরে ক'টা হরতাল হয় তার খবর তো আপনি রাখেন না। রাখলে আর আমার সামনে হরতালের দরুন লজ্জিত হতেন না।'

[১] 'দা' হচ্ছে রুশ 'হ্যাঁ'। শব্দটি আরমানীতেও আছে কিনা জানি না, তবে মিনাস বা মাদাম আস্তনভের পক্ষে আরমানী ভাষায় কথাবার্তা চালাতে চালাতে থেকে থেকে এরকম দু'-একটি রুশ শব্দ মিশিয়ে দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিলো, ঠিক যেমন বাঙালীদের কথাবার্তায়

ঢুকে পড়ে ইংরেজী। *দেশ*-এ এ অংশটি প্রকাশিত হবার পরে 'আইও' শব্দটির মানে জানিয়ে একজন আমাকে চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অর্থটি আমার আর মনে নেই। চিঠি আমি ফেলে দিই নি, কিন্তু পুরোনো কাগজপত্রের স্তূপ ঘেঁটে সে-চিঠি খুঁজে বার করা ১৯৮১-তেই দুঃসাধ্য ছিলো, আর এখন তো অসাধ্য !

[২] শাড়ির প্রসঙ্গে এর চাইতেও বেশী মজাদার অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমার ষাটের দশকের আয়ার্ল্যাণ্ডের অজ পাড়াগাঁয়ে। সেখানে কিছু লোক ধ'রে নিয়েছিলেন যে আমি নিশ্চয়ই একজন বিদেশিনী 'নান্' বা খৃষ্টীয় সন্ন্যাসিনী, কেননা তাঁদের অভিজ্ঞতায় একমাত্র তেমন মহিলারাই আগুল্ফলম্বিত বসন ধারণ ক'রে থাকেন। এটা ধ'রে নিয়ে তাঁরা আমার প্রতি সসম্ভ্রম দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন এবং গ্রামের পথে আমাকে দেখলেই রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে স'রে দাঁড়াতেন।

[৩] আজ আর কন্টিনেন্টে এই অপরিচয়জনিত কৌতূহল এবং তজ্জনিত বাড়াবাড়ি নেই। ভার্সাই-এ পরবর্তী কালে যখন গিয়েছি তখন কোনো কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু ১৯৬৩-র গ্রীষ্মে ভার্সাই-এর পর্যটকদের আদিখ্যেতা আমাকে কতটা বিব্রত করেছিলো তা আমার এখনও মনে আছে। কত টুরিস্ট যে 'মাদমোয়াজেল, সিল্ ভু প্লে' ব'লে টুক্ ক'রে কাছ থেকে বা দূর থেকে আমার ছবি তুলে নিয়েছিলেন তার হিসেব নেই। ভারতীয় নারী দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না তাঁরা সেকালে। ষাটের দশকে একবার আমার কেরলীয় সহপাঠিনী সারা জোসেফ-এর সঙ্গে জার্মানভাষী সুইটজারল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলাম। পাহাড়ী পথে আমাদের দেখলে পথসংলগ্ন স্কুল থেকে ছেলেমেয়েরা পরম উল্লাসে 'ইণ্ডারিন ! ইণ্ডারিন !' ব'লে হট্টগোল করতে করতে বেরিয়ে আসতো, আর বৃদ্ধরা কৌতূহলী হাসি হেসে প্রশ্ন করতেন, 'গান্ধী ? নেহরু ?'—অর্থাৎ 'গান্ধী-নেহরুর দেশের লোক, ঠিক ধরেছি কিনা ?' গান্ধী-নেহরুর দেশের লোক হতে পারা একটা সম্মানের ব্যাপার ছিলো তখন।

সাত

এক-এক দিন সকালে চিলেকোঠার বিছানায় শুয়ে যখন উঠি উঠি মনে হতো, তখন নীচ থেকে শুনতাম তাত্‌য়ানার গলা, ফোনে কথা বলছে।

'আমি কি জ়াক্ দ্য লিয়ঁ-র সাথে কথা বলতে পারি ?...হ্যাঁ, জ়াক্, বানান হচ্ছে...'

তার পর মিনিট কয়েক চুপচাপ। অতঃপর আবার সসংকোচে—'মাপ করবেন, আপনি কে ? ওঃ, দুঃখিত, না না, আমি জ়াক্ দ্য লিয়ঁ-কে চাইছিলাম। দয়া ক'রে ডেকে দেবেন কি ? বানান হচ্ছে...'

এরকম চলতো নির্ঘাত মিনিট দশ-পনেরোর বোঝাপড়া। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পরই বোঝা যেতো যে জ়াকের হদিস এখনও পাওয়া যায় নি, এবং তাত্‌য়ানা ধৈর্যসহকারে চতুর্থ কি পঞ্চম ব্যক্তিকে 'জ়াক' নামের বানান শোনাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে জ়াকের সন্ধান যদি বা মিলতো, তাত্‌য়ানার সঙ্গে তার সর্বদাই বাধতো ফোনের মাধ্যমে ঝগড়া। কথা বলতো ওদিক থেকে জ়াকই বেশী। তাত্‌য়ানা শুধু শুনতো, আর থেকে থেকে কাতর কণ্ঠে বলতো—'না, জ়াক, না। জ়াক, আমার কথা শোনোই না একবার। দয়া ক'রে শোনো, তুমি ভুল বুঝছো আমাকে...না, ঘটনা অন্যরকম...না না, ব্যাপার তা নয়, তুমি কেন এরকম ভিন্ন মানে করছো...তুমি আমার কথার বিকৃত মানে করছো...না না, আমি তোমাকে অপমান করছি না, করতে চাই না মোটেও...'

মাদাম তো অফিসে চ'লে গেছেন। তাত্‌য়ানার গলা সারা বাড়িটা জুড়ে ব্যাকুল আবেদন জানাতে থাকতো, আমি বিছানায় উঠে বসতাম। শেষের দিকে মনে হতো যেন জ়াক তাত্‌য়ানার আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে চ'টে-ম'টে আচমকা ফোন ছেড়ে দিয়েছে, কারণ তাত্‌য়ানা কিছুক্ষণ 'জ়াক, জ়াক, শুনছো, এই জ়াক...' ইত্যাদি ব'লে আস্তে ফোন রেখে দিতো।

এই জ়াক যে সেই প্রাক্-বাস্তিল রজনীর নায়ক তা অনুমান করেছিলাম। তাত্‌য়ানাকে প্রশ্ন করলাম—'আচ্ছা, এই সকালে উঠে রোজ জ়াক-কে ফোন করার রহস্যটি কী ? জ়াক-ই কি সেই ফরাসী যুবক, যে তোমাকে বিয়ে করতে চায় ?'

'ঠিকই ধরেছো। ফ্রান্সে ছেলেদের বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। জ়াক পড়ুয়া ছেলে দেখে এ ছুতো সে-ছুতো ক'রে আজ অবধি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু অবশেষে ওর ত্রিশ বছর পূর্ণ হবার সময় ঘনিয়ে আসছে। এখন তার আগে ওকে নির্দিষ্ট সময় সামরিক তাঁবুতে কাটাতেই হচ্ছে। আমি সেখানেই ফোন করি। ফোন যারা ধরে তারা জ়াকেব মতোই শিক্ষার্থী, নয়তো তারা সেখানকার দেখাশোনা করে। কিন্তু তারা এক-এক মূর্তিমান। প্রথমে

তো নামটা কিছুতেই বুঝতে চায় না, তার পর ডাকতে বেরিয়ে কেউ যেন আর ফিরে আসতে চায় না। বুদ্ধুর দল—'

'কিন্তু জ়াকের সঙ্গে এরকম প্রবল বাদানুবাদ হয় কেন ? টেলিফোনেই বিবাহপ্রসঙ্গ আলোচিত হয় নাকি ?'

'প্রত্যক্ষভাবে হয় না, কিন্তু পরোক্ষভাবে হয়। এই টেলিফোনের নিত্যনৈমিত্তিক ঝগড়াকে আমাদের দুজনকার সম্পর্কের প্রতীক বলতে পারো। সামান্য সামান্য সব ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে আসে ভুল বোঝাবুঝির পালা। অসম্ভব অভিমানী ছেলে জ়াক। একবার যদি ভুল বুঝতে শুরু করে তবে তাকে রোখে কারও সাধ্য নেই। আমাকে তিলে তিলে জ্বালিয়ে খেলো। ইংলণ্ড থেকে ফিরবার পর থেকেই নতুন ক'রে শুরু হয়েছে আমাদের ঝগড়ার পালা।'

'ওর সঙ্গে দেখা হয় না তোমার ? নাকি শুধু ফোনেই সংযোগ ?'

'হয় বৈকি। লাইব্রেরিতে চ'লে আসে ও। যেখানেই বসি, ঠিক খুঁজে বার করে। তার পর কথার ধারে আমাকে কাটতে থাকে। যেমন ধরো, তোমার আসার কথা ওকে আগেই বলেছিলাম। না বললে রক্ষে আছে নাকি ? নইলে বলবে, আমি আমার জীবনের কতক কতক অংশ "ব্যক্তিগত" মার্কা মেরে ওর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাই।

'তার পর সেদিন তোমার সঙ্গে দেখাও হয়েছে। ও চেয়েছিলো যে চোদ্দ তারিখে আমাকে একটা নাচে নিয়ে যায়। কিন্তু জানোই তো, তেরো তারিখের সেই মস্ত গাড়ি-চড়ার পর সারা দিন আমরা প্রায় নড়তে-চড়তে পারি নি। তা ছাড়া তুমি নতুন অতিথি, সবে এসেছো, কবে থেকে ঠিক ক'রে রেখেছি চোদ্দ তারিখে সন্ধ্যায় ম্যদঁ-র উঁচু জমি থেকে দূরে প্যারিসের বাজি আর আলোর খেলা দেখাবো তোমাকে ; অতিথি ফেলে কী ক'রে বান্ধবের সাথে নৃত্যোৎসবে যাই বলো তো ? কাজেই আমি ওকে অনেক বুঝিয়ে নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ও বোঝে নি কিছুতেই। নতুন বন্ধুর জন্য ওকে অবহেলা করছি, তোমার অজুহাত দিয়ে ওর কাছ থেকে দূরে স'রে যাবার চেষ্টা করছি, ওর কাছে ধরা দিতে চাইছি না—ইত্যাদি ইত্যাদি নানান ব্যাখ্যা করেছে ও।

'তাই আমি পরে একদিন বললাম, চলো, তোমার সঙ্গে অন্য একটা নাচে যাবো, আমাদের অতিথি এখন পুরোনো হয়ে গেছে, পথঘাট চিনেছে, এখন একটা সন্ধ্যা একা থাকতে পারবে। ওর প্রতিক্রিয়া হলো অদ্ভুত। বললে, কী ? আমি বুঝি খেলার পুতুল, না ঘুঁটি ? তোমার ইচ্ছা হলে নাচে যেতে হবে, না হলে যেতে হবে না ?

'অনেক তিক্ত কথা-কাটাকাটি হলো। পরদিন ফোনে বললাম, এখনও ভেবে দ্যাখো, আজ সন্ধ্যায় আমি তোমার সঙ্গে নাচে যেতে পারি। সেদিন তো ও দড়াম ক'রে ফোনই রেখে দিলো। প্রায়ই দেয় অবশ্য। আসলে কী জানো, আমার সঙ্গে নাচবার ইচ্ছা থাকলেও বাস্তব অবস্থাটির মুখোমুখি হতে ও যেন দ্বিধাগ্রস্ত।

'নইলে বেছে বেছে এমন অবস্থা ও কেন ঘটায়, যাতে ওর যখন ইচ্ছা তখন আমি কোনো জরুরী কারণে আটকে পড়ায় যেতে পারি না, আর যখন আমি যেতে প্রস্তুত তখন ও অভিমান ক'রে ভাসায় ? এতে কি আমার সম্বন্ধে ওর অবচেতন মনের এক বিচিত্র জটিল ক্রিয়া প্রকাশ পায় না ?

'বিশ্বাস করো, আমার সঙ্গে খিটিমিটি বাধাতে ও সত্যিই ভালোবাসে। সেটাই ওর স্বভাবে পরিণত হয়েছে। যেন ও ভয় পায় আমাদের মধ্যে শান্তি, সৌহার্দ্য, মন বোঝাবুঝি বেশী ক্ষণ স্থায়ী হবার নয়, অথচ আমাকে সম্পূর্ণ ছাড়তেও পারে না ও : আমাদের অস্তিত্ব অন্যোন্যনির্ভর হয়ে পড়েছে। কাজেই এই সম্পর্কটুকু বজায় রাখার জন্যেই ঝগড়া বাধায়।

'সম্পর্ক হতে পারে দু' রকমের—প্রীতির আর কলহের। দুয়ের একটাও যদি না থাকে তা হলে সে-অবস্থার নাম হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কে ঔদাসীন্য, অর্থাৎ সম্পর্কের ইতি। জ়াকের প্রথম প্রতিজ্ঞা হচ্ছে এই যে আমাদের মধ্যে একটা স্থায়ী মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠা আর সম্ভব নয়। হয়তো ওর প্রস্তাবে রাজি হতে আমি এত সময় নিচ্ছি দেখেই ও ধ'রে নিয়েছে যে আমাদের যুগ্ম জীবন হবার কোনো আশা নেই।

'ও সাংঘাতিক নৈরাশ্যবাদী। ওকে যে আমি এত স্নেহ করি অথচ বিয়ে করবার বেলায় সাতপাঁচ ভাবি আর দেরি করার ছুতো খুঁজি, তাতে ও মর্মে মর্মে বিদ্ধ। আমার মনে সংরাগের তীব্রতা না জাগাতে পারার দরুন ও ক্ষুব্ধ এবং আত্মগ্লানিবিজড়িত।

'অথচ আমাকে ছাড়া চলে না ওর, যেমন আমারও চলে না ওকে ছাড়া। আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই, আমরা পরস্পরের বিষয়ে উদাসীন, এ অবস্থা অসহ্য। জ়াক তা কল্পনাও করতে পারে না, চায়ও না। কাজেই সম্পর্ক একটা জীইয়ে রাখতেই হবে। মধুর যদি না হলো তবে তিক্তই থাক। ঝগড়ার মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছে জ়াক।

'সাম্প্রতিকতম কাহিনীটি শোনো। মাঝখানে সে হঠাৎ খেয়ালবশতঃ ব্যারাকে রাত্রিযাপন দুঃসহ মনে ক'রে তিন রাত বিনা অনুমতিতে বাইরে কাটিয়েছে। গ্রামে কোন্ এক মাসী না পিসীর বাড়িতে। ধরা হয়তো পড়তো না, কিন্তু আমি তো কিছু জানতাম না, ঘটনাচক্রে তৃতীয় রাতে আমি ফোন করেছি। তখন ওদের খেয়াল হয়েছে, জ়াক তো নেই। আমি জানি না ওদের ভিতরের ব্যবস্থা কী। দিনের বেলা ড্রিলের সময় নাম-ডাকা নিশ্চয় হয়। ও দিনে বোধ হয় থাকতো, কিন্তু রাতে ফেরে নি। বিনা অনুমতিতে রাতে বাইরে থাকা কী সাংঘাতিক অপরাধ বুঝতে পারছো ? বিশেষতঃ মিলিটারিদের কাছে ? অক্সফোর্ডের কলেজের মতো ! ওর কী শাস্তি হতো জানি না, তবে শেষ পর্যন্ত ও সাহায্যের জন্যে আমারই দরজায় প্রার্থী হলো।

'কী ? না, ও বলবে, ও সেদিন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওর মাসী বললো, ফিরে কাজ নেই, আজ রাতটা এখানেই থেকে যা, এবং প্রমাণস্বরূপ ডাক্তারের সার্টিফিকেট চাই। কোন্

ডাক্তার এ হেন সার্টিফিকেট যোগাবে বলো? জ়াকের পরিচিত কোনো ফরাসী ডাক্তার? কখ্খনো নয়। তবে? কেন, তাত্য়ানার পরিচিতা কোনো রুশ ডাক্তারনী! এমিগ্রে রুশ সমাজে যুবতী ডাক্তারনী কি কেউ নেই? তাদের মধ্যে কেউ কেউ কি তাত্য়ানার পরিচিতা, চাই কি এক স্কুলের মেয়ে বা ঐ গোছের হতে পারে না?

'অগত্যা জ়াক-সহ হাজিরা দিয়ে ধানাইপানাই গল্প ফেঁদে আমার এক ডাক্তার বান্ধবীর কাছ থেকে সার্টিফিকেট যোগাড় ক'রে দিলাম। কে কার জন্যে এতটা করে বলো? নিনা আমার অনেক দিনের চেনা মেয়ে দেখেই এতটা করলো তো?

'কিন্তু সে-যাত্রা রেহাই পেয়ে জ়াকের শিক্ষা হয় নি। উল্টে ও সিদ্ধান্ত করেছে যে এভাবে বাজে সার্টিফিকেট দেখিয়ে আরও রাত বাইরে কাটানো যাবে। আমাকে বলছে আবার সার্টিফিকেট যোগাড় ক'রে দিতে। আমি বলছি, জ়াক, বোঝবার চেষ্টা করো, এ ধরণের আবেদন দ্বিতীয়বার করা সম্ভব নয়।

'ও কিছুতেই বুঝছে না, বলছে—বুঝেছি, একবার সাহায্য ক'রে তোমার অহংকার হয়ে গেছে, আর করবে না। আমি বলছি—দ্যাখো, বান্ধবীর কাছে বারবার মিথ্যা গল্প ফাঁদা যায় না। ও বলছে—হ্যাঁ হ্যাঁ, জানা আছে রুশ ডাক্তারদের সত্যনিষ্ঠা।

'এইভাবে ও আমাকে বিঁধছে, নিজেকেও বিঁধছে। এ সম্পর্ক থেকে আমার মুক্তি আছে কিনা জানি না। জীবনটাকে যদি নতুন কোনো মোড় দেওয়া যেতো, বেশ হতো। একটা নতুন ফ্ল্যাট, একটা নতুন গাড়ি, নতুন কোনো মানুষ। তবে জ়াককে ফেলে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারি না, বুকের ভিতরটা টনটন ক'রে ওঠে।'

'তবে জ়াককেই বিয়ে করো না। হয়তো বিয়ের পরে সম্পর্ক সহজতর হয়ে আসবে।'

'হয়তো করবো শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কিছুতেই মন স্থির ক'রে উঠতে পারি না। আমার মা-মাসীরা বিয়েতে কেউই সুখী হন নি। জেনে-শুনে ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটাতে চাই না।'

তাত্য়ানার দিদিমা শুধু তাঁর বড় মেয়ের দুর্ভাগ্যের কথাই বলতে পেরেছিলেন, অন্যদের কথা বলার সুযোগ পান নি। ছুটির এক দুপুরে মাদাম আস্তনভকে বাগানের টেবিলে তরকারি কাটতে সাহায্য করছি, তিনি নিজেই শুরু করলেন নানান গল্প।

তখনই জানলাম, তাঁর এক বোন থাকেন আর্জেন্টিনায়, অন্য বোন আমেরিকায়, এবং তাঁদের স্বামিসম্পর্ক ছিন্ন। ভাগ্যের কী পরিহাস, বাস্তুচ্যুত তিন বোনের কাউকেই তাদের স্বামীরা পূর্ণ মর্যাদা দেয় নি। বাপের বাড়ি যাদের গেছে, স্বামীরা তাদের ঘর দিয়েও আবার নিষ্ঠুরভাবে কেড়ে নিয়েছে। তবে সুখের কথা, মাদামের মতো তাঁর বোনেরাও শিক্ষিতা এবং মোটামুটি শান্তিতেই জীবনযাপন করতে পারছেন। কৌতূহল প্রকাশ অশোভন হবে জেনে কথা ঘোরাবার জন্য মাদামকে তাঁর নিজের সন্তানদের সম্বন্ধেই প্রশ্ন করলাম।

বুদ্ধিমতী মায়ের চোখ দিয়ে সন্তানদের যে-চিত্র পাওয়া যায় তার বিশেষ দাম আছে। মাদাম নার্সিসিয়েনের চোখে দেখেছিলাম তাঁর সন্তানদের, এবারে মাদাম আস্তনভের চোখে তৃতীয় জীবিত পুরুষের চিত্র দেখতে উৎসুক হলাম।

'আচ্ছা মাদাম, যে-ঘরে পিয়ানোটা আছে তার দেয়ালে ছেলেমেয়েদের যে-গ্রুপ ফোটোটা আছে সেটা কবে তোলা ?'

'সেটা বেশ কয়েক বছর আগে তোলা, এ বাড়িতে আসার আগে। যখন তাত্য়ানার বাবার সঙ্গে থাকতাম। ম্লান হয়ে গেছে, তাই না ? কিন্তু তাকালেই কি মনে হয় না একটি সুখী পরিবারের সন্তান ওরা ? দুটি মিষ্টি ছেলে, একটি বেণী-দোলানো মিষ্টি মেয়ে। আহা, কী সাজানো সংসার ছিলো আমার ! আমার মা কি তোমাকে বলেছেন নাকি যে রান্নাবান্না বিষয়ে আমি কুঁড়ে প্রকৃতির ? কথাটা একেবারে মিথ্যে নয় ! বিয়ের পর ঘরের কাজ আমাকে কমই করতে হতো। প্রথম প্রথম আস্তনভ আমাকে সুখেই রেখেছিলো। ঝি ছিলো, ঝকঝকে আসবাব ছিলো, গাড়ি ছাড়া চলাফেরা করতাম না। যাক গে সেসব কথা...। আমার ছেলেপিলেদের কথাই বলি, ওদের নিয়েই আমার এখনকার যা-কিছু সুখ।

'আমার বড় ছেলের পড়াশোনায় মন কম ছিলো, বড্ড আড্ডা দিয়ে বেড়াতো। মাথায় বুদ্ধি থাকলেও বইপত্রের দিকে সময় দিতে চাইতো না। বাপ নেই মাথার উপরে ; কে দ্যাখে, কে শাসন করে। আমার ছোট ভাই দেখলে যে প্যারিসে থাকলে ও শুধু টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াবে, তাই ওকে ক্যানাডায় পাঠিয়ে দিলে। বিদেশে যাওয়াতে ওর একটা নতুন দায়িত্বজ্ঞান এলো। পরীক্ষা পাস ক'রে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টান্ট হয়েছে। ভালোই চাকরি করছে, একবার টিকিটপত্র কেটে পাঠিয়ে আমাকেও ক্যানাডা দেখিয়েছে,—এখন তাত্য়ানার ইচ্ছা একবার যায়। তবে ও এখন প্রায়ই দেশে চ'লে আসার কথা বলছে। ফরাসী নাগরিকত্ব বদলায় নি, এমন কি রীতিমতো দেশপ্রেমিক হয়ে পড়েছে। বিদেশে গেলে বখাটে ছেলেরও কেমন মহৎ সব ভাব গজায় দেখেছো ? ফ্রান্সে চাকরির ক্ষেত্রে অনেক বেশী ভিড়, অনেক বেশী ঘেঁষাঘেঁষি। মাইনেও পাবে কম। কিন্তু তবু এখানেই ওর যত মায়া। তাত্য়ানার সঙ্গে ওর স্বভাবের খানিকটা মিল আছে! ওরা দুজনেই একটু দিশেহারা গোছের, কী যে চায় নিজেরাই যেন জানে না।

'আমার ছোট ছেলে, যেটা তাত্য়ানার পিঠোপিঠি, আর যার সঙ্গে তাত্য়ানার অষ্টপ্রহর খুনসুটি, তার স্বভাবটা অন্যরকমের। ভাই বা বোন বিয়ে করুক কি না-করুক, সে ঠিক যথাসময়ে নিজের বিয়েটি সেরে নিয়েছে। মোটামুটি চাকরিও একটা জুটিয়ে নিয়েছে। বিয়ে করেছে ফরাসী মেয়ে। মেয়েটি বেশ, তবে আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খায় না। আমরা এমিগ্রে, উদ্বাস্তু, ফ্রান্সের শরণার্থী হয়ে এককালে এসেছি। নানারকমের উত্থানপতন, ভাগ্যবিপর্যয় আমরা দেখেছি। সংগ্রাম ক'রে ক'রে আমাদের বাঁচতে হয়েছে। কিন্তু সে-মেয়ে আদরের দুলালী, আর দু'-চারটা ফরাসী মেয়ের মতো পোশাক-আশাক এসেন্স এসবের মধ্যেই

তার জীবনের পরিধি। বিয়ের পর আমাদের এখানে—হ্যাঁ, এই বাড়িতেই—এক বছর ছিলো ওরা। কিন্তু ফরাসী মেয়ের ধাতে সইলো না শাশুড়ী-ননদের সঙ্গে ঘর করা। আমরা আরমানীরা এরকম যৌথভাবে থেকে অভ্যস্ত—জ়োজ়োদের দেখছো তো?—কিন্তু আজকালকার মেয়েরা তা পারে না। তার অনেক কারণ আছে। তাত্য়ানাই কি পারবে?

'তা ছাড়া, এ বাড়িটাতে কোন্ নববিবাহিতা সংসার পাততে চাইবে বলো? আমরা তো নেহাৎ দায়ে প'ড়ে আছি। উপরন্তু ছেলেপিলের প্রশ্ন আছে। এখন ওদের দুটি ছেলেমেয়ে হয়েছে, জায়গাতেই কুলাতো না এমনিতে। নতুন বাসায় উঠে গেছে ওরা।

'তাত্য়ানার সঙ্গে আমার ছেলের বৌয়ের বনে না। এমনিতে সামনাসামনি ভদ্রতা কুটুম্বিতা অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু ঐ যা বলছিলাম, জ়ান্ আমাদের পরিবারের পটভূমিকা বুঝতে বা জানতে চায় না, আমাদের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ওর আগ্রহ নেই। তাত্য়ানা পড়ুয়া মেয়ে। জ়ানের ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিটির কোনো বালাই নেই, সে অন্য জগতের বাসিন্দা। রুশ-আরমানী আচারব্যবহার রীতিনীতি এসব নিয়ে আমাদের যে-গর্ব, তার তাৎপর্য জ়ান্ বুঝতে পারে না। আমাদের পরিবারের সংস্কৃতিগত যে-বিশেষ রূপ, তাকে আপন ক'রে নিতে ও ঔৎসুক্য দেখায় না কখনো। তাত্য়ানার জানো তো রুশ ভাষা নিয়ে কত গর্ব। জ়ান্ কিন্তু রুশ শিখবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করে নি। ওরা ফরাসীতে কথা বলে, ছেলেমেয়েরাও তাই। কাজেই এই পুরুষ থেকে একজন আস্তনভ সম্পূর্ণ ফরাসী হয়ে গেলো, এই নিয়ে দুঃখ আর কি।'

চকিতে মনে প'ড়ে গেলো তাত্য়ানার সেই আত্মপরিচয়দান: 'আমি ফরাসী।' সেই দৃপ্ত স্বীকৃতির পিছনে যে কতরকমের আবেগজগৎ আছে তা কি তখন সবটা বুঝেছিলাম?

তার মধ্যে আছে অভিমান, আছে তার রুশ-আরমানী পূর্বপুরুষদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী সম্পর্কচ্ছেদ। তার রক্ত, পারিবারিক শিক্ষা এবং ধর্মের টান সত্ত্বেও সে ভুলতে পারে না যে সে এমিগ্রে মাত্র।* যে-রাষ্ট্র তাকে পালন করেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে, নাগরিকের অধিকার দিয়েছে, তার প্রতিই সর্বজনসমক্ষে সে আনুগত্য প্রকাশ করে। তার রুশ বাবা তার দেখাশোনা করে নি, কিন্তু ফরাসী দেশ করেছে। প্রকৃত পিতৃপরিচয়ের থেকে পালক পিতার পরিচয়ই তাই বড় হয়ে উঠেছে। কর্ণ যেমন কুন্তীকে প্রকৃত মা জানার পরেও সূতপত্নীকে মা ব'লে ডেকেছিলেন, এ-ও তেমনই। অথচ অন্তরে অন্তরে তাত্য়ানা তার রুশ উত্তরাধিকারের কথা কখনো ভুলতে পারে না। তাত্য়ানা প্রকৃত অর্থে বাইলিংগুয়াল বা দ্বিভাষিণী ছিলো। তবুও দুটির মধ্যে রুশই তার ঘরের ভাষা। সেই ভাষাতেই তারা তিনটি ভাইবোন খাবার টেবিলে গল্প-গুজব করেছে, মায়ের কাছে আবদার জানিয়েছে। অথচ তার ভাইয়ের সংসারে সে-ভাষার আর কোনো স্থান থাকবে না, তার ভাইপো-ভাইঝিরা জানবে না সে-ভাষা। এই বিয়ের মাধ্যমে তার ভাই যেন আনুষ্ঠানিকভাবে তার উত্তরাধিকারকে পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেলো।

তাত্য়ানা জানে এটা হবেই। এ পুরুষে না হোক, পরের পুরুষে তাদের ফরাসী হয়ে যেতে হবেই। তবুও দুঃখ হয় বৈকি।

তাত্য়ানার ছোট ভাই সপরিবারে ছুটিতে বেড়াতে গিয়েছিলো। আমি থাকবার শেষের দিকে ফিরলো। দেখাও হলো একদিন। সেদিন আমি একাই ছিলাম বাড়িতে। চিলাকুঠি থেকে শুনি সদলবলে কারা যেন বাড়িতে ঢুকে হৈচৈ ক'রে জিজ্ঞাসা করছে, 'বলি বাড়ি আছো-টাছো কেউ ?'

দ্রুতপদে নেমে আসি। তাত্য়ানার মুখের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন মুখের একটি হাসিখুশী যুবক, একটি সলজ্জ মুখের ফরাসী যুবতী। কোলে একটি সন্তান, আর একটি হাঁটি হাঁটি পা পা। চিনতে পারলাম তাদের। তারাও চিনলো আমাকে।

'তাত্য়ানার ভাই ?'

'বলা বাহুল্য। এবং আপনি তাত্য়ানার ভারতীয় বান্ধবী।'

তারা বেশী ক্ষণ বসলো না। বললাম—'আপনাদের ধ'রে না রাখতে পারলে কিন্তু তাত্য়ানা আমার উপর চটবে। কোন্ মুহূর্তে আপনি ফিরবেন তার প্রতীক্ষায় সে আছে, কারণ আপনার পরামর্শে সে অবিলম্বে গাড়ি কিনতে চায়।

খুব হাসলো আন্তনভ জুনিয়র। বোনের আর মায়ের জন্য একটা চিরকুটে চিঠি লিখে গেলো।

তিন ভাইবোনের মধ্যে ছিলো তীব্র টান। ভাইয়েরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত মা-বোনের প্রতি পুরো কর্তব্য করতে পারে নি। দুজনেই আস্তে আস্তে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে। ছোটজনের অজুহাত সে বিয়ে করেছে, তার পরিবার বড় হয়ে গেছে, সে আর পারে না। বড়জন কেন পাঠায় না কে জানে। অত দূর থেকে সে খবর বার করবেই বা কে। মাদাম ছেলেদের টাকা আর নিতে চান না। কিন্তু দুঃখিনী মাকে যে বুড়ো বয়সে আজও মেট্রোয় ক'রে দৈনিক আপিস করতে হচ্ছে, থাকতে হচ্ছে এই ভাঙা চালের নীচে, সেজন্য ভাইদের উপর তাত্য়ানার প্রচণ্ড অভিমান।।

'মাকে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় না ক'রে দিয়ে ওরা কী ক'রে নিজেরা সুখে থাকতে পারছে ? কী ক'রে তাদের একজন বিয়ে করেছে ?'

মাদাম বলেন তাত্য়ানা তার ভাইয়ের এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করার বিরুদ্ধে ছিলো। সে চেয়েছিলো আগে তারা তিনজনে মিলে মাকে একটা নতুন বাসা যোগাড় ক'রে দিক। কিন্তু প্রেমে-পড়া তরুণ সে-নিষেধ মানে নি।

'আমি বলি, চাই না আমার ওদের টাকা। ওরা যে মানুষ হয়েছে, নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা মেটাতে পারছে, তাই আমার যথেষ্ট। আমার তাত্য়ানা কিন্তু বড় ভালো, বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে। শেষ পর্যন্ত এই মেয়েই আমাকে বাসা যোগাড় ক'রে দেবে তা আমি জানি। জানো কেতকী, ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই মায়ের দুঃখটা বেশী বোঝে। ছেলেরা বড় বাউণ্ডুলে, বড়

ঘর-ছাড়া। তাত্‌য়ানা যে আজও বিয়ে করতে পারে নি তার অন্যতম কারণ আমার শেষ জীবনের জন্য একটা ব্যবস্থা না ক'রে ও আমাকে ছেড়ে যেতে চায় না।'

মনে হলো যেন কোনো বাঙালী বিধবার গলা শুনছি। সেই এক সমস্যা—ছেলেরা মাকে মাসোহারা পাঠাচ্ছে না, বোনের বিয়ে না দিয়ে নিজেরা বিয়ে ক'রে নিচ্ছে, মা আঁচলে চোখ মুছে বলছেন, 'আজকাল বুড়ো বাপমায়ের জন্য মেয়েরাই বেশী করে।'

আর ছেলেদের বাউণ্ডুলে বলার মধ্যে বিশ্বাসহন্তা স্বামীর প্রতি পুরোনো অভিমানটাও যেন জেগে ওঠে। মাদাম আন্তনভ সেই নারী, যৌবনে স্বামী যাঁকে বেশী দিন ঘর দেন নি, আজ শেষ জীবনে ছেলেরা যাঁকে একটা ঘর দিলো না। তাত্‌য়ানা আন্তনভ সেই মেয়ে, যাকে তার রুশ বাবা ত্যাগ করেছে, যার অভিভাবক তার আরমানী ছোটমামা, যার দাদা ক্যানাডায়, যার ছোট ভাই ফরাসী বিয়ে ক'রে আলাদা হয়ে গেছে। মাদাম নার্সিসিয়েন সেই ভিটেচ্যুত বুর্জোয়া বৃদ্ধা, যিনি সন্তানদের জন্য আপ্রাণ ক'রেও আজ শেষ বয়সে কারও ঘরে সোয়াস্তি পেলেন না, ছোট হোল্ডলটা নিয়ে আজ এ ছেলের ঘর, কাল ও ছেলের ঘর ক'রে বেড়ান। বিধবা বৃদ্ধা, স্বামিপরিত্যক্তা প্রৌঢ়া, অবিবাহিতা যুবতী—পুরুষ অবলম্বনের অভাবে তিন নারীর জীবনই কিছুটা দিশাহারা। বিচিত্র তাদের জীবনের দ্বন্দ্ব। ভাবলাম, জ়াককে বিয়ে করতে তাত্‌য়ানার যে-অনিশ্চয়তা, তার পিছনে একাধিক কারণ আছে। ফরাসী বিয়ে ক'রে ফরাসী হয়ে যাওয়া—সেটা এমিগ্রে জীবনের চরমতম কম্‌প্রোমাইজ়। মাথা নোয়াতে চায় না তাত্‌য়ানা। তার চাইতে সম্পূর্ণ বিদেশীকে—আফগানকে বা ইংরেজকে—বিয়ে করাও সহজতর। এ ছাড়া আছে তার মায়ের একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবার প্রশ্ন। ভাইয়েরা যখন তাদের কর্তব্য করলো না, তখন বোনই আইবুড়ো থেকে মায়ের প্রতি কর্তব্য করুক।

তাত্‌য়ানার ভাইয়ের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে উঠলো না। দেখতে দেখতে এসে গেলো আমার যাবার দিন। এ ক'দিনে বাড়ির লোক হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু অন্তরঙ্গভাবে যতজনকে জানতে পারা যায়, তাদের মধ্য থেকে খুব কমজনকেই কাছে রাখতে পারা যায়। এ ক'টি দিনে যারা আমার আত্মীয়ের মতো হয়ে উঠেছিলো, তাদের ছেড়ে চ'লে আসতেই হলো।

মাদাম নার্সিসিয়েন পর্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে জিনিসপত্র গুছাতে সাহায্য করলেন। ভোরবেলা আমার যাবার সময়। ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে উঠলো তাত্‌য়ানা। মাকে, দিদিমাকে আর আমাকে জাগালো। আমাকে বিদায় দেবার জন্য মাদাম নার্সিসিয়েন আগের রাতটা এ বাড়িতেই কাটিয়েছিলেন। ফোন ক'রে ট্যাক্সি আনানো হলো। দরজায় দাঁড়িয়ে ছলছল হয়ে এলো দিদিমার আর প্রৌঢ়া মায়ের চোখ। বারবার আমাকে আশীর্বাদ করলেন তাঁরা। আমার আসন্ন মৌখিক পরীক্ষার জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ক'রে মাদাম আন্তনভ বললেন, 'আবার যখন আসবে তখন আমাদের এই চমৎকার প্রাসাদে, এই দুর্গটিতে দেখবে না আশা করি। প্রার্থনা করো যেন নতুন বাসা পাই একটা।'

মাদাম নার্সিসিয়েনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো, আমাকে মাথার উপর চুমু খেয়ে চোখ মুছলেন।

তাত্য়ানা আমার সঙ্গে চললো আমাকে টার্মিনালে পৌঁছে দিতে। নির্জন পথঘাট। বাঁকে বাঁকে সেতু নিয়ে সেইন নদী শুয়ে আছে। ভোরের ঘোলাটে আকাশে হঠাৎ জেগে উঠলো মহীয়ান্—অথবা মহীয়সী—নোত্র্ দাম্। চোখ ফেরানো যায় না। দিনের বেলা দেখেছি লোকের ভিড়ে, পর্যটকদের কোলাহলের মধ্যে। উষার মৃদু আলোয় এখন দেখলাম তার ভাস্বর স্বরূপ। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে ভোরের আলোয় লণ্ডন শহর দেখে যেমন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ অভিভূত হয়েছিলেন, আমিও এ ক্ষেত্রে সেরকম মুগ্ধ হলাম। নাগরিকেরা এখনও সুপ্ত। অবিনশ্বর নোত্র্ দাম্ প্রসন্নমূর্তিতে শূন্য নগরীকে নিরীক্ষণ করছে। ট্যাক্সির জানলা থেকে প্যারিসের বিশ্বনাথমন্দিরের উদ্দেশে আমার শেষ প্রণাম রাখলাম।

তাত্য়ানার জীবন নিয়ে লিখবার অধিকার তাত্য়ানাই দিয়েছিলো। সে-সংকল্প এতদিনে পূর্ণ হলো। বছর ঘুরে গেছে, তাত্য়ানা গাড়ি কিনেছে এবং টুইশনি ক'রে টাকা জমাচ্ছে। তবে বাসাবদলের টাকা এখনও হয় নি। জ়াক সামরিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য মাদাগাস্কারে গিয়েছিলো, এতদিনে বুঝি বা ফিরেছে।[১]

[১] এই কাহিনীর পরিশিষ্ট হিসেবে কিছু বলা উচিত হয়তো। *নারী, নগরী* যখন ধারাবাহিকভাবে *দেশ*-এ বেরোয় তখন তাত্য়ানাকে দু'-এক সংখ্যা পাঠানো হয়। ওর বড় ভালো লেগেছিলো অলোক ধরের আঁকা স্কেচগুলি। 'নিজেকে যে চিনতে পারছি,' বলেছিলো। ব্রাইটনে আমাদের ডেরায় [অর্থাৎ আমার বিয়ের পর] একবার এসেছিলো তাত্য়ানা, কিন্তু তার পর বহুকাল ওর সাথে যোগাযোগ রাখতে পারি নি। দোষ আমারই, আমিই পারি নি চিঠিপত্র লেখা বজায় রাখতে। তাত্য়ানাও এদিক ওদিক আমার ঠিকানার খোঁজ ক'রে নিরাশ হয়েছে। সম্প্রতি ওর সাথে আবার সংযোগস্থাপনের চেষ্টা করি। আমার ধারণা হয়েছিলো যে ওকে আর খুঁজে পাবো না, ভাবছিলাম মিনাসদের বাড়িতে খোঁজ করতে যেতে হবে, হয়তো বা তারাও আর সেখানে নেই, কিন্তু টেলিফোন ডিরেক্টরি ঘাঁটতে ঘাঁটতে পুরোনো ঠিকানাতেই ওর ফোন নম্বর পাওয়া গেলো, এবং ডায়াল করতেই পাওয়া গেলো ওর গলা। সেপ্টেম্বরে ঘণ্টাখানেকের জন্যে প্যারিসে ওর সাথে দেখা হয়। তাত্য়ানা এখনও অবিবাহিতা, ডক্টরেট করেছে, একটা চাকরি করে, মায়ের সঙ্গে সেই বাড়িটাতেই থাকে এখনও, যদিও ওর বর্তমান সংকল্প হচ্ছে বাড়িটাকে ভেঙে ফেলে সেখানে একটা নতুন বাড়ি তোলা। দিদিমা মারা গেছেন। তাত্য়ানা আরও অনেকটা ফরাসী হয়ে গেছে এবং ইংরেজীও অনেকটা ভুলে গেছে,—জানালো যে এটা হয়েছে আমার সঙ্গে ইংরেজীতে আড্ডা মারবার সুযোগের অভাবেই। সব শেষে জানাই যে তাত্য়ানা আস্তনভ

আমার বান্ধবীর আসল নাম নয়, এবং এ কাহিনীতে ব্যবহৃত আরও কয়েকটি নামও ছদ্মনাম।

টীকার উপর টীকা যোগ ক'রে বলা প্রয়োজন, বর্তমান সংস্করণে দুটি আসল নাম ফিরিয়ে এনেছি। পূর্ববর্তী দুই প্রকাশে ব্যবহৃত ছদ্মনামগুলির মধ্যে ছিলো এই দুটি : ডাঃ দ্রজ্‌দভ ও মারিয়া দ্রজ্‌দভ। প্রকৃতপক্ষে এঁরা হচ্ছেন অধ্যাপক ডাঃ নিকোলাস জ়ার্নভ ও তাঁর স্ত্রী মিলিৎসা জ়ার্নভ, অক্সফোর্ডে ছাত্রজীবনে আমি যাঁদের স্নেহধন্য ছিলাম। আমার প্রবন্ধের বই *ভাবনার ভাস্কর্য*-এ রুশ লেখক সল্‌ঝেনিৎসিন প্রসঙ্গে এঁদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপচারির প্রতিবেদন আছে। এঁরা দুজনেই এখন গত হয়েছেন, এবং এখন এঁদের নাম প্রকাশিত হলে কারও কোনো ক্ষতি হবে না, বরং তাঁদের কাছে আমার ঋণটুকু স্বীকার করা হবে। দুঃখের সঙ্গে এও কবুল করি যে তাত্‌য়ানার সঙ্গে যোগাযোগেও আমার আবার বহুকাল যাবৎ ছেদ পড়েছে, এবং ফ্রান্সের হাল আমলের কম্পিউটারাইজ়ড্‌ টেলিফোন-সন্ধানী ব্যবস্থায় তার হদিস মিলছে না।

নোটন নোটন পায়রাগুলি

ক্যারোলাইন, জামিলা ও লেস্‌লি-কে

পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশের মুখবন্ধ

নর্টন হিল একটি কল্পিত নাম। ঠিক ঐ নামে বৃটেনে কোনো জনপদ আছে ব'লে জানা নেই আমার। কিন্তু নামটা কল্পিত হলেও জায়গাটা একেবারে অলীক নয়, এবং সেখানকার মানুষগুলোও আমাদের থেকে খুব একটা দূরে নয়।

নর্টন হিলে ব'সে চিঠি এবং ডায়েরি লিখছে একটি বাঙালী নারী। তার এক বছরের কাগজপত্র থেকে তার এবং তার চারদিকের মানুষদের যে-জীবনকাহিনী ফুটে উঠছে তা-ই এই উপন্যাস। নোটন দাশের একেকটি চিঠি বা ক্রমান্বয়ে লেখা কয়েকটি দিনলিপির একেকটি গুচ্ছই এই উপন্যাসটির একেকটি অধ্যায়; আর কোনো অধ্যায়বিভাগ নেই। ধারাবাহিক প্রকাশের জন্যে পাণ্ডুলিপিটিকে সংখ্যাচিহ্নিত কতগুলি অংশে যেভাবে ভাগ করতে হয়েছিলো এখন আর তার কোনো প্রয়োজন নেই ব'লে সে-রীতি বর্জন ক'রে পাণ্ডুলিপির মূল পরিকল্পনাটিকেই পরিবেশন করা গেলো।

অন্তরঙ্গ কেউ কেউ আমাকে কখনও কখনও উপন্যাস লিখতে অনুরোধ করলেও সে-কথায় তেমন কান দিই নি। উপন্যাস লেখার আইডিয়াটা আমার মাথার মধ্যে সিরিয়াসভাবে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন রমাপদ চৌধুরী। পেরে উঠবো কিনা সে-বিষয়ে আমার নিজের সন্দেহ ছিলো, কিন্তু শ্রীযুক্ত চৌধুরী আমার পারঙ্গমতায় গভীর আস্থা প্রকাশ করেছিলেন ব'লে তাঁকে বিশেষভাবেই স্মরণ করছি। আমার প্রথম উপন্যাসকে সাদরে গ্রহণ ক'রে *দেশ* পত্রিকার মাধ্যমে দেশবিদেশের বহু বাঙালীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে একটি বড় ধন্যবাদ জানাই শ্রীসাগরময় ঘোষকে।

এই উপন্যাসে তাদের স্বরচিত কয়েকটি কবিতা ব্যবহার করতে দিয়েছে আমার দুই পুত্র: ভার্জিল পূজারী ও ইগর নীলাদ্রি। ড্যাফোডিল ফুল বিষয়ে তাঁর একটি কবিতা অনুবাদে ব্যবহার করতে দিয়েছেন আমার পরিচিত অক্সফোর্ডবাসী একজন কবি, যিনি 'ব্ল্যাকি ফর্চুনা' এই ছদ্মনামে লিখে থাকেন। নোটন দাশের ৮ই মার্চের ডায়েরিতে কবি অ্যান স্টিভেনসনের কবিতা থেকে দুটি উদ্ধৃতি আছে; ৮ই মে-র ডায়েরিতে শেক্সপীয়রের *ওথেলো* নাটক থেকে একটি এবং অ্যান স্টিভেনসনের কবিতা থেকে একটি উদ্ধৃতি আছে। আর যেসব উদ্ধৃতির উৎস দেওয়া নেই সেগুলি পাঠকেরা সহজেই চিনতে পারবেন আশা করছি।

পরিশেষে, নানাভাবে সাহায্য করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমার তিন বান্ধবী ক্যারোলাইন, জামিলা ও লেস্‌লি-কে এবং আমার স্বামী রবার্টকে।

গ্রন্থকার

৫ই সেপ্টেম্বর

মা গো,

প্রায় এক মাস যাবৎ চিঠি দিতে পারি নি তোমাকে। এত ব্যস্ত ছিলাম। আজকে তপু-জপুদের স্কুল খুলে যাওয়াতে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। সকালেই মাথা ঘ'ষে, স্নান ক'রে, বিছানার চাদর বালিশের ওয়াড় সব বদলে, ব্রেকফাস্টের আর কাল রাতের বাসনপত্র ধুয়ে তোমাকে লিখতে বসেছি।

তা-ও কতক্ষণ সময় হাতে পাবো জানি না। এখন ঠিক এগারোটা। অতীন বেরিয়েছে দশটা নাগাদ, ব'লে গেছে দেড়টায় ফিরবে, তবে ওর দেওয়া সময়ের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। অসম্ভব ব্যস্ত আছে। গত কাল সকালে এরিকা ফিরেছে বেলফাস্ট থেকে। যদিও কাল বিকেলেই ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর সঙ্গে ছু' ঘণ্টা কথা ব'লে এসেছি, তবুও আমাদের এখানে আরও ছু' ঘণ্টা কথা না বললে গ্রীষ্মের ছুটির পরেকার নতুন টার্ম শুরু হওয়ার মঙ্গলাচরণ এরিকার মতে সুসম্পন্ন হবে না। যে-কোনো মুহূর্তে সদর দরজার ঘণ্টি বেজে উঠতে পারে।

কিংবা হয়তো পিছনের গেটটা দিয়ে বাগানে ঢুকবে। ফুলের বেডগুলোকে পর্যবেক্ষণ করবে, নেতিয়ে পড়া চারাগুলোকে দাঁড় করিয়ে কাঠি পুঁতে ঠেকিয়ে রাখবে, আপন মনে বিড়বিড় ক'রে মন্তব্য করবে, টকাস টকাস ক'রে ছুটো গোলাপ ছিঁড়ে নেবে, তার পর রান্নাঘরের দরজায় ছুটো থাপ্পড় মেরে ডাক দেবে, 'কই গো, তোমাদের বাড়িতে চায়ের জল ফুটলো ?'

জপু আপার জুনিয়রে উঠেছে। আপার জুনিয়রে ছু' বছর থাকতে হবে। ওর ভয়ংকর ছুশ্চিন্তা—নতুন শিক্ষিকার সঙ্গে বনবে কি না, কলম দিয়ে ঠিকমতো লিখতে পারবে কি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন থেকে ওকে কলম দিয়ে লেখা অভ্যেস করতে হবে, এত দিন তো পেন্সিলেই লিখতো। ছোটদের জন্য তৈরি শেফার্স-এর 'নো নন্‌সেন্স পেন' ওকে একটা কিনে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে একটা জ়িপ্-ওয়ালা প্ল্যাস্টিকের পেন-কেস্। খুব খুশী ও।

॥ বেলা তিনটে ॥ যা বলেছিলাম তোমাকে। আমি উপরের অংশটুকু লিখতেই ঘটাং ক'রে বাগানের লোহার গেটটা খোলার শব্দ হলো, তার পর একটা খুটখুট জুতোর আওয়াজ রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সোজা চ'লে গেলো ফুলের বেডগুলির দিকে। আমি নীচে এসে দেখি

এরিকা ঘাসের উপর হাঁটু গেড়ে ব'সে তন্ময় হয়ে আমার হলিহকের প্রথম লাল ফুলটাকে দেখছে।

তোমার মনে আছে, তোমাকে গল্প বলেছিলাম, গত বারে আমি যখন দিল্লী থেকে ফিরছিলাম, তখন আমার পাশের সীটে বসেছিলেন রাজনীতি করেন এমন এক মহিলা, নাম ঊর্মিলা দেবী? উত্তর প্রদেশের মেয়ে, এখন কলকাতার বাসিন্দা, দিল্লীতে কনফারেন্স ক'রে ফিরছিলেন।

চোখ বুঁজলেই এখনও পরিষ্কার দেখতে পাই তাঁকে। ছিমছাম, চোখে কালো কাচের চশমা, ঘাড়ের উপর নরম চুলগুলো আলতো ক'রে একটা বাদামী ক্লিপ দিয়ে আটকানো ছিলো—বারবারই খুলে আঁট করছিলেন ক্লিপটাকে। ওঁর পরনে ছিলো রাজস্থানী কাজের টিয়ারঙ একখানা সুতী শাড়ি। সেই একটা দিন কত না গল্প করেছিলাম আমরা দুজনে: সংসারের সুখদুঃখ, স্কুল-কলেজে শিক্ষার হালচাল, কলকাতার সমস্যাবলী, দেশের অবস্থা, রাজনীতির উত্তেজনা, পার্টিদের ওঠা-নামার কাহিনী, আরও কত কী কথা। দেখেছিলাম যে ভারী অকপট মেয়ে, অনেক বিষয়েই অনেক কিছু গঠনমূলক চিন্তা ছিলো তাঁর। বারবার বলছিলেন, 'ঈশ্বরের দয়ায় দেশের জন্য কিছু কাজ ক'রে যেতে চাই।'

হাতব্যাগ খুলে একটা কাগজের খাম বার ক'রে আমাকে বলেছিলেন, 'ফুল ভালোবাসেন? ফুলের বীজ বোনার মতো এতটুকু জায়গা কোথাও আছে? তবে এই নিন আমার নিজের বাগানের হলিহকের বীজ, খুব ভালো ফুল হবে।'

কাগজে মোড়া সেই বীজগুলোকে আমি এক বছর ফেলে রেখেছিলাম আমার হাতব্যাগের একটা পকেটে। গত হেমন্তে ফিরে বাগানের যে-অবস্থা দেখেছিলাম তার মধ্যে আর নতুন কোনো এক্সপেরিমেন্ট করার সাহস হয় নি। এ বছর জঙ্গল হাসিল করার প্রবল উদ্যমের মধ্যে ঐ বীজগুলোকেও একটা ট্রে-তে ছেড়ে দিয়েছিলাম। একটা মোটে অঙ্কুর বেরোলো প্রথমে। অনেক সপ্তাহ অপেক্ষা ক'রে, অনেক জল ঢালাঢালি ক'রেও আর বেরোলো না। তখন ঐ চারাটাকে একটা টবে চালান ক'রে ট্রে-টাতে অন্য ফুলের বীজ ফেললাম। তখন নতুন চারাদের সাথে সাথে আরেকটা হলিহক উঠলো। এই দুটোই, আমার হলিহক 'ক' এবং 'খ', এখন মাটিতে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত। 'খ' এখনও ছোট আছে, কিন্তু 'ক' বেশ লম্বা হয়ে গেছে—অনেক কুঁড়ি ধরেছে, আর দিন তিনেক যাবৎ প্রথম ফুলটা খুলেছে। বীজেদের অঙ্কুরোদ্গমের হারের অনেক ব্যাপারস্যাপার আছে। প্রথম বছর হারটা খুব উঁচু থাকে, তার পরে খুব তাড়াতাড়ি নীচে নেমে যায়। বিশেষতঃ দেশের বা এখানকার ভিজে জলবায়ুতে।

আমাদের বাগান সম্বন্ধে জপু একটা কবিতা লিখেছে। নীচে লিখে পাঠালাম।

OUR GARDEN

Our garden has a lot of things.
Under the ground little seeds are growing.
Rain makes the plants grow,
Getting a gentle touch of rain,
And all the plants are sucking away.
Rabbits run here and there.
Dark is the ground which is for the moles
Each little bird is singing.
New little buds are budding.

প্রত্যেকটি পঙ্‌ক্তির আদ্য অক্ষর মিলে 'Our Garden' হয়। খরগোশদের কথাটা ও কল্পনা থেকে জুড়েছে। আসলে যা আছে তা হলো কাঠবিড়াল।

॥ সাড়ে চারটা ॥ আবার কিছু সময় কেটে গেছে। তপু-জপু ফিরেছে আধ ঘণ্টার উপর হলো। তোমাকে লিখতে লিখতে কখন পৌনে চারটে বেজে গেছে। ছুটে বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখি বড় রাস্তার ও পারে অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে ওরা। জপুর প্রথম কথাই হলো : 'আমি সাংঘাতিক কালি খরচ করেছি, আর আমি কিছুতেই বেহালা শিখতে চাই না এ কথা মনে থাকে যেন।' তপু দাবা খেলার ক্লাবে নাম লিখিয়েছে।

তপুকে আরেকটা বছর আপার জুনিয়রে থাকতে হচ্ছে। কম্‌প্রিহেন্সিভে যেতে হলে সেপ্টেম্বরের আগেই এগারো পূর্ণ হওয়া চাই। অক্টোবরে না জ'ন্মে ৩১শে অগাস্টে জ'ন্মে থাকলে এ বছরেই কম্‌প্রিহেন্সিভে চ'লে যেতে পারতো। কিন্তু তার বদলে ওকে আরেকটা পুরো বছর প্রাইমারি স্কুলে কাটাতে হবে। কারণ কম্‌প্রিহেন্সিভ স্কুলে শুধু স্কুল ইয়ারের গোড়াতে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বরে, নতুন ছেলেমেয়েদের নেওয়া হয়। বছরের মাঝখানে বা অন্য কোনো টার্মে জয়েন করা যায় না।

আমার নিজের তো খুব ইচ্ছা যে জপু বেহালাটা শেখে, যদিও সেটা বোধ করি আমার নিজেরই ছেলেবেলাকার অভিলাষের অভিক্ষেপ। নিজের না-মেটানো ইচ্ছেগুলোকে ছেলেমেয়েদের দিয়ে চরিতার্থ করিয়ে নেওয়ার জেদটা সব বাপ-মায়েরই কম-বেশী দুর্বলতা, তাই না ? হয়তো বা কীর্তিকে সম্ভব করার জন্য প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত পরিকল্পনা এটা। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে দুরূহকে করায়ত্ত করতে হলে হয়তো এমন একটা চাবিকাঠি লাগে, হয়তো এমন একটা তাগাদার মোচড় ছাড়া কঠিন কোনো কাজ শেখা যেতো না। মা গো, তোমার সংগীতানুরাগটা দোলনের মধ্যে গাইতে পারার ক্ষমতায় রূপান্তরিত হতে পেরেছে, আমার মধ্যে থেকে গেছে শুধু ড্রাগ অ্যাডিক্টের অপ্রতিরোধ্য দুর্বলতার মতো। তবু তাই সই।

জপুকে পিয়ানোটা ধরানোর উদ্দেশ্যে উপায়ান্তর না দেখে গোটা বারো-চোদ্দ সহজ সুর নিজেই শিখে নিয়েছি,—অতীন তো সময়ই পায় না ওকে নিয়ে বসতে। বেশ কয়েকটা সুর তুলে ফেলেছে জপু। প্রত্যেকটা নতুন সুর ধরার আগে মিনিট দশেক প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে ও। 'এ ভয়ংকর কঠিন, এ অসম্ভব, এ আমি কোনো দিন শিখতে পারবো না,' ইত্যাদি ইত্যাদি। তার পর শেখা হয়ে গেলে মুখ টিপে হাসে। অতীনও নাকি ছেলেবেলায় এরকম করতো। তপু কানে শুনে গোটা পাঁচেক সুর শিখেছে, কিন্তু স্বরলিপি মেরে-কেটে কিছুতেই শেখানো গেলো না,—ও তাকাবেই না সেদিকে।

তপুদের স্কুলে পিয়ানো শেখার কোনো ব্যবস্থা নেই—প্রাইমারি স্কুল তো—কিন্তু বাছাই-করা কয়েকজন বেহালা শিখতে পারে। অতীনের আর আমার দুজনেরই খুব সাধ যে জপু বেহালাটা শেখে। চলতি টার্মে নাম লেখাতে হবে। সেজন্যেই তো প্রথম দিনই প্রতিবাদপন্থী প্ল্যাকার্ড খাড়া ক'রে ফেলেছে জপু।

ওদের অঙ্ক শেখা নিয়ে তুমি আর ভেবো না তো। আজকাল অতীন ওদের অঙ্কটার চার্জ নিয়েছে। জপু *বিটা ম্যাথমেটিক্স*-এর পার্ট টু শেষ ক'রে পার্ট থ্রী ধরেছে। তপুও কেম্ব্রিজ স্কুল ম্যাথমেটিক্স প্রোজেক্ট ধ'রে অনেকটা এগিয়ে গেছে। দশমিক, ভগ্নাংশ, আর জ্যামিতি নিয়ে বেশ মেতেই আছে দুজনে। একটু আগেই দেখে এলাম দুজনে দুটো কার্ডবোর্ডের মডেল বানাচ্ছে। কাঁচি, কার্ডবোর্ড, আঠা, আর জ্যামিতির বাক্স নিয়ে খাবার টেবিলে ব'সে গেছে। তপু একটা আয়তক্ষেত্রকে কর্ণের সাহায্যে দু' ভাগে ভাগ ক'রে কেটে ফেলেছে। জপু আরেকটা আয়তক্ষেত্রকে দুটো সমান মাপের আয়তক্ষেত্রে বিভক্ত ক'রে সযত্নে কাটছে। তপু জ্ঞান দিচ্ছে, 'এ সব কাজ কি রুলার-পেন্সিলে ঠিকমতো হয়? নির্ভুল কাজের জন্য লেজ়ার-রশ্মি লাগে।' শুনলে তোমার দৌহিত্রের কথাটা?

এ বছর এ দেশে নাকি আপেলের 'বাম্পার হার্ভেস্ট' হচ্ছে। আমাদের গাছের আপেলগুলোতে সত্যি বেশ রঙ ধরেছে। চড়াই আর শালিকের দল সাংঘাতিক তাকে তাকে আছে। শীগগিরই আপেলগুলো ঘরে না তুললে প্রত্যেকটা ফল ঠুকরে ঠুকরে খাবে, অক্ষত অবস্থায় একটাও উদ্ধার করা যাবে না। আমাদের মইটাকে অতীন ওদের নতুন অফিসে নিয়ে গেছে: ওটা ছাড়া উঁচু ডালগুলোর নাগাল পাওয়া মুশকিল।

এরিকা আজকে বেশী ক্ষণ বসে নি। হলিহকের প্রথম ফুলটাকে খুব সংবর্ধনা জানালো। ঐ চারাটির প্রতি ওর বিশেষ দরদ। যখন একটা অঙ্কুরও বেরোচ্ছিলো না, তখন ও প্রায়ই এসে বলতো, 'রোদে দাও, রোদে দাও, ট্রে-খানাকে রোদে রাখো। ভারতবর্ষের বীজের কি এই উত্তরের গ্রীষ্মে ঘুম ভাঙবে?' তার পর নিজেই ট্রে-টাকে রোদে টেনে আনতো। ফলে আমাকে আরও দু'-গুণ জল ঢালতে হতো। অতীন বলে যে বীজের ট্রে একটু ছায়ায় ছায়ায় রাখাই ভালো, তাপমাত্রাটাই জরুরী, প্রত্যক্ষ সূর্যালোক অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু এরিকার মতে এই বীজ যেহেতু 'বিদেশী', সেহেতু 'স্পেশ্যাল কেস'। প্রথম চারাটা যখন বেরোলো তখন

এরিকার ভাবখানা এমন যেন ওর কোনো ভাগনে বা ভাগনী ভূমিষ্ঠ হয়েছে। দ্বিতীয় চারাটার জন্ম তো ওর কাছে প্রায় মিরাক্‌ল্‌-এর পর্যায়ে প'ড়ে গেলো। পৃথিবীর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনাগুলো বিষয়ে খুব তীব্র, ধনুকের ছিলার মতো টানটান ওর প্রতিক্রিয়া। হলিহকের বীজদুটো যে কত দূর থেকে এসে এখানকার মাটিতে শিকড় গাড়লো, সে-কথা ভাবতে ভাবতে চঞ্চল হয়ে পড়ে ও। বিড়বিড় ক'রে বলে, 'ঠিক আইরিশ মানুষের মতো। প্রবাসে স্বগৃহ।' আমার মনে প'ড়ে যায় ঊর্মিলা দেবীর ঘাড়ের উপরকার নরম চুলগুলি, তাঁর রাজস্থানী শাড়িখানা, মিষ্টি হাসিটুকু, তাঁর স্বচ্ছন্দ সপ্রতিভ বাংলায় সেই সামান্য হিন্দী 'অ্যাক্‌সেন্ট'-এর আভাস, যা তাঁর রম্য ব্যক্তিত্বকে আরও আকর্ষক ক'রে তুলছিলো। মা গো, তুমিও তো কাশীতে বালিকাবয়স কাটিয়ে কলকাতার কলেজে পড়তে এসেছিলে। এরিকা বলে যে নর্টন হিল তার কাছে বিদেশ। বেলফাস্ট থেকে নর্টন হিল যতটা দূর, কাশী থেকে কলকাতা তার চাইতে বেশী দূর। কলকাতা থেকে নর্টন হিল আরও অনেক দূর।

এরিকা চ'লে যাবার পরই অতীনের ফোন এলো। বললো যে সরস্বতী দেবী আমাদের সপার খেতে ডেকেছেন। তার পর আমাকে তুলে নিতে এলো।

আজ সকালে অতীনকে টেলিফোন করেছিলেন উনি। অতীনদের পুরোনো কলেজটাতে ওঁর পরিচিত একটি নাইজেরীয় মেয়েকে ভর্তি করাতে চান। নতুন কলেজটার কথা তখনও বলা হয় নি ওঁকে। অতীন ওঁকে বলেছে বেলা একটায় বাড়ি ফেরার পথে ওঁর ওখানে হয়ে আসবে। আমাকে বলেছে দেড়টায় ফিরবে। একটার সময় সরস্বতী দেবীর বাড়ি থেকে ফোন : 'উনি সপার রেঁধে ব'সে আছেন, তুমিও এসো না।'

নতুন কলেজটার কথা শুনে সরস্বতী দেবী ভারী খুশী। ওঁর চেনা মেয়েটি ভর্তি তো হবেই, ভবিষ্যতেও ওঁর সূত্রে অনেক ছাত্রছাত্রী আসবে। আফ্রিকায় আর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ওঁদের অনেক চেনা-জানা লোক আছে। একটা দারুণ দক্ষিণী ঝাল আচার খেলাম ওঁর বাড়িতে।

॥ রাত এগারোটা ॥ অতীন বাসন ধোয়া সেরে টাইপরাইটার নিয়ে বসেছে। তপুরা মাত্র আধঘণ্টা আগে শুতে গেছে। ভীষণ বাড়াবাড়ি করছে আজকাল—এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকা। আজকে খুব দেরি হয়ে গেছিলো রান্না চাপাতে। প্রায় আড়াই বছর বাদে আজ সন্ধ্যেয় লণ্ডন থেকে রেবেকার ফোন। রেবেকাকে মনে আছে তো তোমার? তোমার কাছে ছবি আছে,—সেই যে চোখে-চশমা, টিকালো-নাক ইহুদী মেয়েটি, যার মা সমাবর্তনে এসে খুব উদ্বিগ্ন মুখে মিস্ ফস্টরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'দ্বিতীয় শ্রেণীর ডিগ্রী ভালো ডিগ্রী তো, মিস্ ফস্টর?'—আর আমরা কোন্ দিকে তাকিয়ে হাসি চাপবো ভেবে পাচ্ছিলাম না!

সেই রেবেকা এখন দুই সন্তানের মা। মেয়ে স্কুলে যায়, ছেলে মন্টেসরিতে। রেবেকা কাজ করে লণ্ডনের একটা বড় কোম্পানিতে। ফার্মটা কম্পিউটার তৈরি করে। রেবেকা আছে

প্রশাসনিক একটা পদে ; পদটা নাকি ওর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইহুদী বিজ়নেস কানেক্‌শন হবে আর কি।

শুনিয়ে দিলো যে সামনের শনিবারে মার্কিন মুলুকে বিজ়নেস ট্রিপ করতে যাচ্ছে। পনেরো দিন বাচ্চারা স্বামীর কাছেই থাকবে। ওর স্বামীটি যে এত কর্মতৎপর হয়ে পড়েছে তা জানতাম না। অবশ্য ওদের একজন পার্টটাইম ন্যানি আছে, নয়তো দু' দিক সামাল দিতে পারতো না রেবেকা। তা ছাড়া ওর বাড়ির মাথা থেকে পা পর্যন্ত গ্যাজেটে ঠাসা,— বড়লোকের মেয়ে তো।

অনেক গ্যাঁজালো রেবেকা। 'অ্যাঁ, তুমি ভারতবর্ষে এক বছর কী ক'রে কাটিয়ে এলে বলো তো ? তোমার স্বামী কিছু বললো না ? আমরা বাপু পনেরো দিনের বেশী বিরহ সহ্য করতে পারি না। একবার আমার কর্তাকে পনেরো দিনের জন্য কুয়ালা লুম্পুর যেতে হয়েছিলো। গিয়ে তার সে কী হাঁসফাঁস।'

আলু-ফুলকপি ভাজবার জন্য ডীপ্‌-ফ্রাইংপ্যানের তেল আগুনে চাপিয়েছি, এদিকে রেবেকার গল্প আর শেষই হয় না—বিপজ্জনক অবস্থা। তারই মধ্যে তপু চেঁচাচ্ছে, 'মা, নার্ভাস ব্রেকডাউন কাকে বলে ?' কারণ টেলিফোনে আমাকে বলতে শুনেছে যে সিডনিতে আমাদের পুরোনো বন্ধু অ্যান্টনির নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। কান সর্বদাই খাড়া তো। ও হ্যাঁ, অ্যান্টনির ব্রেকডাউনের খবরটা তো তোমাকে দেওয়া হয় নি।

আজ বিকেলে *রেডিও টাইম্‌স্*-এর ফিল্ম-রিভিউ-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জপু জিজ্ঞাসা করেছিলো, 'an agonizing choice between friendship and duty—এর মানে কী, মা ?'

উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, যদিও বুঝতে পারছিলাম যে উদাহরণটা এলেবেলে হয়ে যাচ্ছে, ঠিক জোরদার হচ্ছে না। 'এই যেমন ধরো তোমাদের বন্ধু এডওয়ার্ড, এরিকার ছেলে, যদি টাকা চুরি করে—'

তপু বাধা দিয়ে বললো, 'কত টাকা ? পাঁচশো পাউণ্ড, না দু' পাউণ্ড ?'

'সে যা-ই হোক না কেন—'

'বা রে, দু' পাউণ্ড হলে অতটা চিন্তা নেই, চেপে রাখা যাবে। পাঁচশো হলে সিরিয়স ব্যাপার, পুলিশে খবর দিতে হবে।'

'প্রিয় বন্ধুকে ধরিয়ে দেবার সময়ে তোমাদের যে-মনের দুঃখ, যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার কথাই এখানে বলা হচ্ছে।'

'আরে বাবা, দুঃখটা কিসের ? পাঁচশো পাউণ্ড চুরি ক'রে থাকলে জেলে যাবে না তো কী ? সাংঘাতিক কাজ—রেল ডাকাতির মতো,'—রায় দিলো তপু।

ভালো কথা, আমার ইলেক্‌ট্রিক ব্লেণ্ডারটাতে কাজের কেমন সুবিধে হচ্ছে জানতে চেয়েছো। যা সুবিধে হয়েছে তা আর বলবার নয়। শুধু যে চোখের নিমেষে স্যুপ বা গাজরের

হালুয়া তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাই নয়, সব চেয়ে বড় কথা এই যে পেঁয়াজবাটা করাটা আর বিভীষিকা নয়। স্টীল গ্রেইটারে গ্রেইট্ ক'রে ক'রে পেঁয়াজবাটা তৈরি করা মানে নাকের জলে চোখের জলে হওয়া আর আঙুলের ছাল তোলা। অতীন আবার কালিয়ার যম। অবশ্য সেজন্য ওকে দিয়েই পেঁয়াজ গ্রেইট্ করাতাম! এই ব্লেণ্ডারটাতে মোটা ক'রে কাটা পেঁয়াজ আর এক চামচ জল ফেললেই ত্রিশ সেকেণ্ডের মধ্যে—এরিকার ভাষায় একটি মেষশাবকের দুবার লেজ নাড়ার সময়ের মধ্যে—পেঁয়াজ আর জলের পার্ফেক্ট ঘ্যাট হয়ে যাচ্ছে। নেট্ লাভ হয়েছে অতীনের। এখন আর কালিয়া প্রোডাক্শন মোটেও দুশ্চিন্তার বিষয় নয়। এ দেশের হিসেবে দামও তেমন কিছু নয়, মাত্র ষোলো পাউণ্ড—আমার জুতোজোড়ার দাম তার থেকে বেশী—এবং আগেই যে কেন কিনি নি তা ভেবে এখন রীতিমতো আফসোস হচ্ছে। অনেক ঝামেলা বাঁচানো যেতো।

কালিয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেলিভিশনে আমাদের প্রিয় কমেডি সিরিজ় *দ্য গুডিজ়্* দেখা হলো। দুটো কাজ একসঙ্গে করা সহজ কথা নয়। হাসির চোটে প্রায় বদহজম হয়ে যায়, আলু-ফুলকপি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঐ জন্য তপু-জপুর শুতে যেতে আরও দেরি হয়ে গেলো। দাঁত মাজবে, না গান গাইবে?—

গুডি—জ়্
গুডি গুডি য়াম্ য়াম্—

কিন্তু অতীন বই বগলে বিছানায় ঢুকছে। এবারে শেষ করি।

প্রণামান্তে
নোটন

৬ই সেপ্টেম্বর

প্রিয় দোলন,

অতীনের পাঠানো শেষ প্যাকেটটা পেয়ে গেছিস জেনে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অবশ্য নিখিলের ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ক'রে পাঠালে চিঠিপত্র খোয়া যাবার সম্ভাবনা খুবই কম, তবুও প্রাপ্তিসংবাদ না আসা পর্যন্ত মনটা নিশ্চিন্ত হয় না।

দেশের উদ্দেশ্যে চিঠিপত্র রেজিস্ট্রি করতে করতে ফতুর হয়ে গেলাম রে। বড় প্যাকেট কেন, সাধারণ একটা খাম ফেলতে গেলেও আজকাল নিয়ম ক'রে বলি, 'ওসব শৌখিন ডাকটিকিট দেবেন না, রানীর মাথাওয়ালা টিকিট দিন।' এঁরা খুব অবাক হয়ে বলেন,

'কেন বলুন তো?' তখন বোঝাতে হয় যে টিকিটের জন্যই চিঠি লোপাট হয়ে যেতে পারে। অথচ চিঠিপত্র তো ডাক-কর্মচারীদের হাত দিয়েই যায়, চোর-ছ্যাঁচোড়ের হাত দিয়ে নয়। এঁরা বিশ্বাস করতে পারেন না যে কোনো সভ্য দেশে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে। কিরকম লজ্জা লাগে বল্ তো। এত দিনে আমাদের পাড়ার ডাকঘরের অন্ততঃ একজন মহিলা ব্যাপারটার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করেছেন। উনি সর্বদাই আমাকে রানীর মাথাওয়ালা টিকিট দেবার চেষ্টা করেন। এই তো সেদিন বললেন, 'আজকে রানীওয়ালা এগারোর টিকিট নেই, কিন্তু দশ আর এক দিয়ে ক'রে দিচ্ছি।' কিন্তু আরেকজন আছেন যাঁর কিছুতে ব্যাপারটা মনে থাকে না, আর বারবার মনে করিয়ে দিতে এত লজ্জা লাগে। ইনি জমকালো টিকিট বেচতে খুব ভালোবাসেন। আমি কিছু বলতে পারার আগেই দারুণ দারুণ ডিজ়াইনের নতুন ইশ্যু-হওয়া টিকিট দমাদ্দম লাগিয়ে দেন।

তোদের ওখান থেকে একটা চিঠি ডাকে দিতে হলে তিনটে আলাদা কাউন্টারে যাওয়ারও দরকার পড়তে পারে। একজন ওজন করবেন, আরেকজন বই দেখে মাসুল বলবেন, তৃতীয় জন টিকিট বেচবেন। আমাদের পাড়ায় ঠিক তার উল্টো। অবশ্য বড় বড় কেন্দ্রীয় ডাকঘরে চিঠিপত্র রেজিস্ট্রি করার জন্য বা পার্সেল জমা নেওয়ার জন্য আলাদা কাউন্টার থাকে ঠিকই, কিন্তু আমাদের পাড়ার মতো ছোটখাট ডাকঘরে সবাই সব কিছু করেন। আমাদের এখানে সাধারণতঃ দুজন মহিলা বসেন,—আমাদের পাড়ায় যিনি সকালের ডাক বিলি করেন তিনিও মহিলা,—ওঁদের হাতের কাছে সব সময় টিকিটের তাড়া থাকে, আর দুজনের মাঝখানে থাকে একটা ওজন করার যন্ত্র। চিঠি এগিয়ে দিলেই এঁরা এক হাতে ওজন ক'রে ঝোলানো তালিকা থেকে এক পলকে মাসুল দেখে নিয়ে অন্য হাতে টিকিট ছিঁড়ে বিদ্যুৎগতিতে জ্যাপ্ জ্যাপ্ ক'রে সেঁটে পাশের একটা ঝোলায় খামটা ফেলে দেন। চিঠি রেজিস্ট্রি করা বল্, পার্সেল নেওয়া বল্, ডাকঘরের সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট-সংক্রান্ত কাজ বল্, সবই এঁরা করেন। হয়তো প্রথম খদ্দেরকে টিকিট বেচলেন, দ্বিতীয় জনের চিঠি রেজিস্ট্রি করলেন, তৃতীয় জনের পার্সেল নিলেন, চতুর্থ ব্যক্তিকে সেভিংস ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা দিলেন বা তার জন্যে তাঁর কাছ থেকে টাকা জমা নিলেন। তা ছাড়া এঁরা সরকারের তরফ থেকে মায়েদের জন্যে সন্তান-ভাতা এবং বুড়োবুড়ীদের জন্যে পেনশনও বিলি করেন। উপরন্তু এঁরা রেডিও বা টি-ভি লাইসেন্সের টাকা, টেলিফোন, গ্যাস বা ইলেক্‌ট্রিসিটি বিলের টাকা, রোড্ ট্যাক্স মায় অটোমোবিল অ্যাসোসিয়েশনের চাঁদাও জমা নেন। দ্যাখ্ দেখি, ওঁরা যদি একেকজনে এত রকমের কাজ করতে পারেন, তা হলে আমাদের দেশের পুরুষমানুষেরা পারেন না কেন রে? আর এঁরা কলেজে পড়া মেয়েটেয়ে নন, সাধারণ ঘরোয়া মেয়ে।

তোদের পাড়ার ডাকঘরের একজনকে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগতো রে— এনকোয়ারি কাউন্টারের বুড়ো দাদুকে, যিনি বই দেখে মাসুল বাতলে দিতেন। তিনি ছিলেন, বলতে পারিস, ঐ ডাকঘরটির বুদ্ধিজীবী, এমন একজন মানুষ যাঁর মধ্যে ঐ গ্রন্থলব্ধ

মাসুলজ্ঞানের দৌলতে এসেছিলো একটা আন্তর্জাতিকতার মাত্রা, একটা সাক্ষর বিশ্বনাগরিকতার ছোঁয়া। উনি গোড়াতেই আমাকে ওঁর চার্জে নিয়ে নিয়েছিলেন। 'এই সব মোটা মোটা মাসুলের ফরেনে যাবার চিঠি, দিদি, আপনি বাইরের বাক্সটাতে ফেলবেন না, সেটা নিরাপদ নয়। আমাকে দেবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে টিকিট ক্যান্সেল ক'রে ঝোলায় ফেলে দেবো।' কাজেই টিকিট সাঁটার পর চতুর্থ দফায় আমি আবার হাজির হতাম ওঁর দপ্তরে। উনি সগর্বে টিকিটগুলোর উপর ছাপ মেরে খামটি তুলে ধ'রে বলতেন, 'এবার নিশ্চিন্ত তো?'

একবার আমি একটা মোটা চিঠির একাধিক টিকিটের কয়েকটাকে সামনে আর কয়েকটাকে পিছনে সেঁটেছিলাম। উনি বললেন, 'সামনেই সাঁটুন, বা পিছনেই সাঁটুন, সবগুলো টিকিট এক জায়গায়, পাশাপাশি বসাবেন। নয়তো হবে কি, কেউ ভাববেন যে এখানে কম টিকিট লাগানো হয়েছে, তাড়াতাড়িতে উল্টে দেখবেন না, চিঠিটা পাশে রেখে দেবেন। পরে তিনি হয়তো উল্টে দেখলেন যে না, পুরো মাসুলই দেওয়া হয়েছে বটে। ততক্ষণে আপনার চিঠিখানির রেলে চাপতে এক ঘণ্টা দেরি হয়ে গেলো। কিন্তু এক ঘণ্টা দেরিই বা হতে দেবেন কেন?'

এক ঘণ্টা দেরিই বা হতে দেবেন কেন? ওঁর এই প্রশ্নটা আমার মনে বেশ প্রতিধ্বনিত হয়। বুড়ো দাদুর মতো মানুষ যতদিন আছেন ততদিন দেশের ভবিষ্যৎ আছে রে।

একদিন তোদের ডাকঘরে খুব ভিড়, তারই মধ্যে দেখি উড়ো ডাকের খাম হাতে এক শ্বেতাঙ্গ বিহ্বল হয়ে তাকাচ্ছেন কাউন্টার থেকে কাউন্টারান্তরে। কোন্ দিকে যাওয়া উচিত বুঝতে পারছেন না। একবার ভাবলাম, এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করি, অথচ লাইনে নিজের জায়গাটা ছাড়া ঠিক হবে মনে হলো না। তার পর দেখলাম যে উনি বুদ্ধিমানের মতো এনকোয়ারির লাইনে যোগ দিয়েছেন। তখন নিশ্চিন্ত হলাম। বুড়ো দাদু উড্ লুক্ আফ্‌টার হিম্!

মাকে পাঠানো তপু-জপুর একটা সুন্দর রঙিন স্কুলে-তোলা ছবি স্রেফ উধাও হয়ে গেলো মাস দুয়েক আগে। ও ঠিকানায় ফরেন চিঠি কখনো খোয়া যায় না এ বিশ্বাসে খামটা রেজিস্ট্রি করি নি। খামটা বাক্সে ফেলার মুহূর্তেই মনটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিলো। যা আশঙ্কা করেছিলাম হলোও তাই। মা বলছে যে মাদের পাড়ায় সম্প্রতি পিওন-বদল হয়েছে, হয়তো সে-কারণে চিঠিটা অন্য কোনো বাড়িতে ভুলে ডেলিভারি দেওয়া হয়েছে, হয়তো সে-বাড়ির বাসিন্দারা ফরেন ফোটো দেখার লোভে ওটা খুলেছে, আর ফেরত দেয় নি। কারণ খামের গায়ে লেখা ছিলো: 'ফোটোগ্রাফ, প্লীজ্ ডু নট্ বেণ্ড্'। ওরকম নির্দেশ এখানে দেওয়ার রেওয়াজ, আমি সর্বদাই সে-প্রথা অনুসরণ ক'রে থাকি। এখন বুঝতে পারছি যে খামটা রেজিস্ট্রি না ক'রে ওরকম লেখাটা নিছক বোকামি হয়েছে।

বল্ তো, তপুদের ফোটো দিয়ে কার কী লাভ? ওরা কি ফিল্ম স্টার না ক্রিকেট স্টার যে ওদের ছবি হাতে পেয়ে লোকে মূর্চ্ছা যাবে? এরিকা জানতে চাইছে: অন্যের নাতির ছবি

নিয়ে রেখে দেবে এমন ছোট মন কার হ'তে পারে? ভারতবর্ষ সম্পর্কে ওর যে-মানসিক চিত্র, তাতে এরকম ইতরতার কোনো স্থান নেই। ও মনে মনে একটা ধারণা ক'রে নিয়েছে যে ইণ্ডিয়া হলো মোটের উপর আয়ার্ল্যাণ্ডের মতো দেশ—কৃষিপ্রধান, পল্লীপ্রধান, ধর্মাচ্ছন্ন, পারিবারিক বন্ধনে বিশ্বাসী ইত্যাদি। সেখানকার মানুষ গরিব হ'তে পারে, ন্যাংটো হ'তে পারে, কুটিরে বা বস্তিতে থাকতে পারে, রাস্তায় ভিক্ষে করতে পারে, মাদার টেরেসার আশ্রয়ে স্বর্গে যেতে পারে; সেখানে শোষণ, দুর্নীতি, ফাটকাবাজি, মুনাফাবাজি সবই থাকতে পারে,—এ সবই ওর বোধগম্য, কিন্তু ডাকের পথে কেউ অন্যের চিঠি খামোকা খুলে পড়বে, আসল দিদিমাকে বঞ্চিত ক'রে দুটো অনাত্মীয় ছেলের ফোটোগ্রাফ চুরি ক'রে নিজেদের কাছে রেখে দেবে, এমন মানসতার কোনো অর্থ ও খুঁজে পায় না, এটা ওর প্রটেস্টান্ট বিশ্ববীক্ষার অন্তর্গত নয়। ওর বিচারে, ডাকবিভাগের কেউ যদি কাজটি ক'রে থাকে, তা হ'লে সেটা গর্হিত তো বটেই, যদি কোনো প্রতিবেশী ক'রে থাকে তা হ'লে তো রীতিমতো অবিশ্বাস্য। এরিকা রাজনীতি বোঝে, দলাদলি বোঝে, দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ-সাম্প্রদায়িকতা-শ্রেণীসংগ্রাম-নকশাল-আন্দোলন কোনোটাই ওর বৌদ্ধিক বৃত্তের বাইরে নয়, কিন্তু এটা ওর বুদ্ধির বাইরে।

যাক গে, কী আর করা যাবে বল্, টাকাগুলো জলে গেলো। ছবিটার একটা কপি আমাদের কাছে আছে, কিন্তু নেগেটিভ নেই,—স্কুলে তোলা তো।

অতীনদের টার্ম শুরু হ'তে আর মাত্র দু' সপ্তাহ বাকি। দিন দশেক আগে ওরা শহরের কেন্দ্রে একটা বাড়ি পেয়ে গেছে। তার ঘরদোরের সংস্কারসাধনে নিবেদিত এখন: তপু-জপুও ওয়ার্ক-শার্ট প'রে মহাব্যস্ত ছিলো ক' দিন, কিন্তু কালকে থেকে ওদের স্কুল খুলে যাওয়াতে মিস্ত্রীগিরি আপাততঃ বন্ধ আছে।

তিন দিন আগে ওদের ফোনের কানেক্শন এসেছে। তার পরেই তপুর গলা: 'মা, আমরা একটা বিরাট পার্টিশন ভেঙে ফেলেছি। ভাঙা জিনিসগুলো ভ্যানে ক'রে সরানো হচ্ছে, ভালো দরজাগুলো বিক্রি করা হবে। সিঁড়ির কার্পেট এসে গেছে,—বাদামী রঙের, তা ছাড়া টেবিল-চেয়ার, দেরাজ, আরও কত কী। জপু ন্যাকড়া দিয়ে দেয়াল ধুচ্ছে, তার পর ক্রীম রঙ করা হবে। রঙটার আসল নাম ম্যাগনোলিয়া, ক্যাটালগে তাই লেখা আছে। অতীন বলে, ম্যা—গ্‌নো—লি-য়া আইসক্রীম! আমি বলি, ধুৎ, আইসক্রীম হলো কো—য়া—লি-টি! অতীন বলে, কোয়ালিটি তো কালকের জিনিস, ম্যাগ্‌নোলিয়া হলো ঠাকুর্দার আমলের আইসক্রীম। ঠিক নাকি, মা?'

তার পর দম নিয়ে বলে, 'ভালো কথা, বার্ট্ আর লেস্ (অতীনের বন্ধুদ্বয়) খুবই দয়ালু লোক। আমাকে আর জপুকে আজকে দুবার আইসক্রীম খাইয়েছেন। অফিসটার কাছেই যে একটা আইসক্রীমের দোকান আছে তুমি জানতে না তো, হুঁ হুঁ!'

অতীনকে ওরা এখনও নাম ধ'রেই ডাকে। আর অন্য কিছু বলবে না বোধ হয় কোনো দিন। এরিকার ছেলে আর মেয়েও তাদের বাবাকে নাম ধ'রে ডাকে। ষোলো বছর

বয়স হলে নাকি পুত্রেরা মিত্র হয়? এ দেশে ছ'-সাত বছর বয়সেই সে-পদে উঠে যায় তারা। যন্ত্রশাসিত দুনিয়ায় বাবা হলেন ফেলো-ম্যান, ইনফর্মেশন এবং নো-হাউ-এর উৎস। অবশ্য বাইক থেকে প'ড়ে গিয়ে হাঁটু কেটে রক্তারক্তি হলে মায়ের কোলে চেপে হাউ হাউ ক'রে খানিকটা কেঁদে নেওয়া অপরিহার্য হতে পারে।

তোর মনে আছে দেশ ছাড়বার আগে কলেরা ইঞ্জেক্শন নেবার দৃশ্যটা? বসবার ঘরে ব'সে তপুর সেই তাত্ত্বিক বীরত্ব, বিলেতের এলাহী ব্যাপারস্যাপারের বর্ণনা, হীথরো এয়ারপোর্টের আর হাইজ্যাকিং-এর গল্প, কন্কর্ডের কেরামতির কাহিনী? তার পর ইঞ্জেক্শন দিতে পৌরসভার লোকটি যেই এলেন, অমনি পুলিশ দেখলে চোরাগোপ্তা কারবারীর মুখের অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেমন মুখের অবস্থা হয়ে গেলো দুজনারই। শেষে আমার কোলে চেপে ইঞ্জেক্শন নিয়েছিলেন বিলেতী বীরদ্বয়।

তপুর কারেন্ট 'হট্ ফেভরিট' হচ্ছে পাঁউরুটির উপর চটকানো কলা। কাঁটা দিয়ে নিজেই থেঁতলে নেয়। আর জপু এখনও চীনাবাদামবাটার ভক্ত। আজকাল নিজেই রুটি সেঁকে পীনাট্-বাটার লাগিয়ে নিতে পারে। তোদের ঝুমুরের কি এখনও খাওয়া নিয়ে আগেকার মতো বায়নাক্কা আছে?

এইমাত্র ফিরলো ওরা। দরজার ঘন্টি বেজে উঠতেই বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠেছিলো। নিজেরাই বড় রাস্তা পার হলো নাকি ওরা? দরজা খুলতেই 'নিজেরা রাস্তা পার হয়েছি' ব'লে নৃত্য। ওদের মুখ দেখেই অবশ্য বোঝা গেলো যে সেটা বাজে কথা, আসলে পাশের বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে পার হয়েছে। আজকাল অবশ্য ওরা ছোট রাস্তাগুলো নিজেরা পার হয়, সাইকেল নিয়ে চক্কর মারতে বেরোয়, পার্কে উধাও হয়ে যায়। চিরকাল তো আর ওদের বেঁধে রাখা যাবে না। শুধু আমাদের বড় রাস্তাটাই এখনও একটা বিভীষিকা রয়ে গেছে।

এরিকা ফিরেছে দু' দিন আগে। ও যখন 'দেশে' ছিলো, সে-সময়ে জেরাল্ড্ এসেছিলো, আমাদের এখানে দু' দিন ছিলো। তার পর ডাব্লিনে গেছে। শুনে এরিকা খুব চেঁচামেচি করলো, খবর দিয়ে আসে নি কেন জেরাল্ড্। তার পর নরম হয়ে বললো, 'ফেরত যাবার পথে আবার যেন আসে। আমার কাছে এলেনরের আনা সোনালী লেবেলের মদ আছে।' আমি অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে বললাম, 'কী নাম? "গোল্ড্নার অক্টোবর" বুঝি?' ও বললো, 'অতশত জানি না, সোনালী লেবেল-মারা জার্মান মাল এ পর্যন্ত জানি। ওতেই হবে। তুমি লিখে দিও। আর হ্যাঁ, তোমরা যদি রাতে খেতে আসো, দয়া ক'রে সকালে খবর দিয়ে আসবে।'

এরিকা আমার জন্য আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে কী কী এনেছে শোন্: ওর বড় ভাশুরের বাগানের শালগম; আলুর রুটি,—দেখতে আমাদের পরটার মতো; ওদের স্পেশ্যাল টক রুটি; এবং সে-রুটি বানাবার জন্য একটা বিশেষ পাউডার। ওকে বারবার ব'লে দিয়েছিলাম

ওর ননদের কাছ থেকে আমার হায়দ্রাবাদী চুড়িদুটো উদ্ধার ক'রে আনতে। মনে রেখেছে কিনা জানি না। এখনও জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হয় নি। প্রথমে ওর বব্-পিসের গল্প শুনতে হলো। সেই বড়লোক পিসে, বুঝলি, যিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন। আংক্‌ল্ বব্ নাকি ওকে একটা বড় নিলামে নিয়ে গেছিলেন। বলেছিলেন, 'যা চাও, দর করো, আমি চেক লিখে দেবো।' তা এরিকাটা এমন, কিচ্ছু কেনে নি। শৌখিন আসবাব, রুপোর মোমবাতিদান—কিছুই পছন্দ হয় নি তার। শুধু পছন্দ হয়েছিলো আয়ার্ল্যাণ্ডের গ্রামগঞ্জের নামধামের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে একখানা 'বিখ্যাত' বইয়ের প্রথম সংস্করণ। কিন্তু সারা সকাল অপেক্ষা ক'রেও নাকি বইগুলোর টার্ন এলো না। লাঞ্চটাইম পার হয়ে গেলো। আংক্‌ল্ বব্ বুড়োমানুষ, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইবেন ? অতএব 'বিখ্যাত' বইখানাও কেনা হলো না এরিকার।

এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলো। তপু পার্ক থেকে ভিজতে ভিজতে ফিরেছে। হলিহক বাদে অন্য ফুলগুলো নেতিয়ে পড়েছে। ভ্যালেরি আমাকে কয়েকটা তুলসীর চারা দিয়েছিলো। ওগুলো এবার ঘরে আনতে হবে, বড্ড হলদে হয়ে যাচ্ছে। রেবামামীর সঙ্গে দেখা হলে বলবি তো, আমাকে তুলসীর বীজ পাঠাবেন বলেছিলেন, তার কী হলো ?

এখনকার মতো উঠি। রাতের রান্না আছে। ভাজা মুগের ডাল করা আছে। একটা ডিমের চচ্চড়ি করবো ভাবছি। ও হ্যাঁ, তোকে তো একটা খবর দেওয়া হয় নি : অতীন আবার মাছ আর মাংস খাওয়া ধরেছে, জানিস ? আমার প্রচণ্ড সুবিধে হয়েছে। পরে আবার লিখবো।

॥ ৭ই সেপ্টেম্বর ॥ খুব বৃষ্টি হয়েছে কাল রাতে। আজ সকালে জানলা থেকে দেখতে পাচ্ছি তার ফলাফল। লিনারিয়া আর ন্যাস্টার্শিয়ামগুলো একেবারে শুয়ে পড়েছে। গোলাপের ঝাড়টাকেও খুব কাহিল দেখাচ্ছে। আপেলগুলো ভিজে সবুজ পত্রালীর ফাঁকে ফাঁকে লালচে আলো ঠিকরাচ্ছে—ইডেন উদ্যানের নিষিদ্ধ লোভনীয় ফল যেন।

আমাদের রান্নাঘরের পাশে যে-উইলো গাছটা, তার সমস্ত ডালপালা জুলাই মাসে কাটা হয়েছিলো, তোকে লিখেছিলাম। ছিলো শুধু কাণ্ডটা। কয়েক সপ্তাহ চুপচাপ ন্যাড়া থেকে তার পর দারুণ জীবনীশক্তি দেখিয়ে একরাশ কচি কচি ডালপালা বার করেছে গাছটা। দুর্দম এই উইলো জাতটা। সবাই বললেন যে গুঁড়িটাতে বিষ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। নয়তো আবার কয়েক বছরের মধ্যেই গাছটা দৈত্যাকার হবে। অতীন যথারীতি 'কালকে করবো, পরশু করবো' ব'লে ব'লে কাজটা স্থগিত রাখছিলো। এদিকে কাণ্ডটার মাথায় নতুন পাতাগুলো আনন্দে দুলছে একটা বিরাট মুকুটের মতো, যেন কোনো সবুজ রঙের পাখীর পালক দিয়ে তৈরি রেড ইণ্ডিয়ান মুকুট। দুর্দান্ত এক পুনরুজ্জীবন। আমি অতীনকে বললাম, যেটা করতেই হবে সেটা স্থগিত রাখলে গাছটার উপর আরও মায়া প'ড়ে যাবে। কাণ্ডটা যখন ন্যাড়া ছিলো, তখন বিষ দিলে ঠিক হতো। এখন বিষ দেওয়া মানে যেন দ্বিতীয়বার,

আনুষ্ঠানিকভাবে গাছটাকে হত্যা করা। যাই হোক, অবশেষে অতীন গুঁড়িটার কয়েকটা জায়গায় তুরপুন দিয়ে ছোট ছোট ছ্যাঁদা ক'রে সোডিয়ম ক্লোরেট ইঞ্জেক্ট করেছে, তার পর তুলো দিয়ে ছ্যাঁদাগুলোর মুখ বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

ঘটনাটা জপুর মনে বেশ রেখাপাত করেছে: ও কয়েকবারই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, গাছটার মৃত্যুতে তুমি কি খুশী?' আমি বুঝিয়েছি যে আমি খুশী নই, বরং দুঃখিতই, কিন্তু আর কোনো উপায় নেই, গাছটা আবার বড় হলে আমাদের বাড়িতে রোদ একেবারে ঢুকবে না, আর শীতের দেশে সেটা একটা মস্ত কষ্ট। তার পর ওর প্রশ্ন, 'তা হলে অতীন কি খুশী?' আবার বোঝাই যে না, অতীনও খুশী নয়, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবেই কাজটা করতে হচ্ছে। এ বাড়িটাতে আমাদের যে-পূর্বসূরিরা রান্নাঘরের দরজার এত কাছে এমন একটা গাছ লাগিয়েছিলেন তাঁরাই ভয়ংকর বোকামি করেছিলেন।

এরিকা বললো যে সোডিয়ম ক্লোরেট সাংঘাতিক জিনিস, শুধু বিষ নয়, বিস্ফোরকও, তপুরা যেন কোনোমতে নাগাল না পায় ওটার। আয়ার্ল্যাণ্ডের সন্ত্রাসবাদীরা নাকি ওটা দিয়ে বোমা তৈরি করে।

গাছটার পাতার মুকুটটার দিকে প্রায়ই তাকাই। পাতাগুলো বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে কিনা বুঝবার চেষ্টা করি। বুঝতে পারি না। ডগাগুলোতে একটু হলদে ভাব দেখতে পাই যেন, তবে সেটা সোডিয়ম ক্লোরেটের প্রভাব, না হেমন্তের রঙ, তা বুঝে উঠতে পারি না। হাওয়া দিলেই দুলতে থাকে পাতাগুলো। বিষ—তাও বেশ খানিকটা হজম করার শক্তি আছে কঠিন প্রাণের। এ গাছটার জীবনীশক্তি অত সহজে ধ্বংস হবে ব'লে মনে হচ্ছে না।

এটা আমার জঙ্গল দূর করার বছর। সামনে নেট্‌ল্‌-এর যা জঙ্গল হয়েছিলো তা আর বলবার নয়। নেট্‌ল্‌-এর কথা মনে আছে তো তোর?—একরকমের বিছুটিপাতা, যেগুলোর জ্বালায় পাপু অতিষ্ঠ হতো। অতীনকে বারবার ব'লে ব'লে ওগুলো উৎখাত করানোর চেষ্টায় আছি। সমস্ত শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। আগামী বসন্তের জন্য ওখানে ড্যাফোডিল আর ব্লুবেল-এর বাল্‌ব্‌ পুঁততে চাই। নেট্‌লের ঝোপ আমি নিজে কম উপড়াই নি। সর্বাঙ্গ ঢেকে দস্তানা প'রে করতে হয়। তবে সামনের জঙ্গলটা একটা রাক্ষুসে ব্যাপার! ওটার বিরুদ্ধে পুংশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন।

বর্তমানে হ্যারি বার্কেট নামে এক প্রৌঢ় ইংরেজ ভদ্রলোক আমার অনরারি গার্ডেনিং অ্যাড্‌ভাইজ়র। যতদিন আমাদের প্রতিবেশী বিল ব্রাউন বেঁচেছিলেন ততদিন উনিই অতীনকে উপদেশ-টুপদেশ দিতেন। ওঁর মৃত্যুর পর থেকে একটা পদ যেন খালি প'ড়ে ছিলো, এখন হ্যারি বার্কেট সেখানে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

এঁকে তোর মনে আছে কিনা জানি না। তুই যখন এখানে এসেছিলি তখন একবার রাস্তায় এঁর সঙ্গে তোর দেখা হয়েছিলো, আমি আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। তখনও ওঁকে ততটা ভালো ক'রে জানতাম না, এখন জানি।

নর্টন হিলে প্রায় কুড়ি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আসলে লেক ডিস্ট্রিক্টের লোক। বছর এই বাষট্টি। স্কুলমাস্টার ছিলেন, এখন রিটায়ার করেছেন। স্ত্রী, দুই মেয়ে, নাতি-নাতনী আছে। বছর কয়েক আগে ওঁর নাকি নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়,—নিজেই বলেছেন আমাকে। তার পর সুস্থ হয়ে ওঠেন। বছর দুই আগে উনি হঠাৎ কবিতা লিখতে শুরু করেন। বেশ ভালো কবিতা। আসলে উনি ছিলেন একজন অবদমিত কবি। ওঁর ভাষাতেই বলি তোকে :

'লেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে সোজা লণ্ডনে গেলাম ইতিহাস অনার্স পড়তে। সে-সময়ে কলেজের ছেলেমেয়েরা সবাই দারুণ আদর্শবাদী এবং বামপন্থী। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে উত্তেজনা, অডেন আর স্পেণ্ডারকে নিয়ে হৈচৈ। ডিগ্রী পেয়েই যুদ্ধে যেতে হলো। ইতোমধ্যে প্রচণ্ডভাবে প্রেমে প'ড়ে বিয়ে ক'রে ফেলেছি। ক্লারা লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যারাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতো। যুদ্ধ, তার পর রোজগার, শিক্ষকতার ক্লান্তি, মেয়েদের মানুষ করা—এই সব করতে করতে সময় কেটে গেছে। শারীরিক বা মানসিক কারণে অনগ্রসর ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় স্পেশ্যালাইজ় করেছিলাম আমি, ফলে বুঝতেই পারছো ধকলটা। যৌবন থেকেই কবিতা লেখার ইচ্ছে ছিলো, কিন্তু সাহস পাই নি। ভাবতাম, বড় বড় সব কবিরা লিখছেন, আমার মতো একজন সামান্য মানুষের বক্তব্যের মূল্য কতটুকু? কবিতা লেখার আকুতিটাকে চেপে রাখতাম। পালিয়ে যেতাম মাছ ধরতে। প্রত্যেক গ্রীষ্মাবকাশে আমি পনেরো-কুড়ি দিনের জন্য লেক অঞ্চলে চ'লে যাই স্যামন আর সামুদ্রিক ট্রাউট ধরতে। সে-ক'টা দিন আমি আমার মাছ ধরায় উৎসাহী দু'-একজন বন্ধু ছাড়া আর কারও সঙ্গ চাই না। এমন কি ক্লারারও না। চাঁদের আলোয়, শিয়ালের ডাক শুনতে শুনতে মাছের প্রত্যাশায় সেই সারা রাত ব'সে থাকার উন্মাদনা! সাধারণতঃ আমি ও অঞ্চলে পৌঁছে ক্লারাকে একটা খবর দিয়ে দিই, তার পর ঠিক ফিরে আসবার আগে আবার জানিয়ে দিই যে ফিরে আসছি। অন্তর্বর্তী কালে স্ত্রী, কন্যাদ্বয়, এখানকার বন্ধুবান্ধব—কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার তাগিদ অনুভব করি না।'

'আপনার স্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কী?' জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁকে।

'হ্যাঁ, এটা ঠিক যে বছরের পর বছর ঐ ক'টা দিন ক্লারা নিজেকে খুব প্রত্যাখ্যাত অনুভব করতো। মানে গোড়ার দিকে। কিন্তু তার পর ও যখন বুঝতে পারলো যে ঐ অবকাশটুকু আমার সুস্থতার পক্ষে—অর্থাৎ আমার আধ্যাত্মিক সুস্থতার পক্ষে—অপরিহার্য, তখন আর আপত্তি করতো না। ক্লারা নিজে খুব গুণের মেয়ে। এককালে অভিনয় করতো। অনেক নামী দলের সঙ্গে অভিনয় করেছে। আজকাল আর করতে চায় না। অথচ ওর গলাটা এখনও দারুণ। ভালো কবিতা-আবৃত্তি করতে পারে। অন্ধদের জন্য সাহিত্যপাঠের ক্যাসেট-টেপ করার একটা ব্যবস্থা আছে, জানো বোধ হয়। কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। অনেক নাম-করা অভিনেতা-অভিনেত্রী বিনা মূল্যে ক'রে থাকেন। ক্লারা আজকাল তাই করছে। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর আমি বসি কবিতা লিখতে। ক্লারা চ'লে যায় শোবার ঘরে, দরজা বন্ধ

ক'রে ক্যাসেটে গল্প-কবিতা রেকর্ড করে। এটা ওর লেবার অফ্ লাভ্, যা থেকে ও সংগ্রহ করছে অন্যকে বিনা মূল্যে কিছু দেবার আনন্দ। কাজেই ক্লারাও একরকম ক'রে নিজের জীবনে কিছুটা পূর্ণতা এনেছে। তা ছাড়া মেয়েরা বড় হয়ে যাবার পর থেকে চাকরিও করছে।'

ক্লারা নর্টন হিল পুলিশ স্টেশনে কোনো একটা প্রশাসনিক পদে আছেন। হ্যারি বলেন যে ওঁর ব্রেকডাউনের সময়টা ওঁর স্ত্রীর পক্ষে খুব কঠিন হয়েছিলো। সে তো হবেই।

'উঃ, সে যে কী সাংঘাতিক ডিপ্রেশনের মধ্যে দিয়ে গেছি আমি ! যে-বাগান আমার প্রাণ, একটা বছর ছুঁই নি তার কোনো কাজ। ঘাস কাটা, আগাছা তোলা—সব ক্লারাকে করতে হয়েছে। বাগান করা তো দূরের কথা, নিজের পায়ের জুতোর ফিতেটুকু পর্যন্ত বাঁধতে পারতাম না। রাতে আমরা বিছানার দু' প্রান্তে প'ড়ে থাকতাম দুজন অপরিচিত মানুষের মতো। আমাদের মাঝখানে গ'ড়ে উঠেছিলো যেন এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর।'

'সেরে উঠলেন কিভাবে ?'

'ইলেক্‌ট্রিক শক্ চিকিৎসায় আমার কোনো উপকার হয় নি, বরং ডিপ্রেশন বেড়ে গিয়েছিলো। তার পর কতগুলো ওষুধে কাজ হলো। এখন আর কোনো সমস্যা নেই। কবিতা আমার থেরাপি। তার সাহায্যে ফিরে পেয়েছি আমার যৌবন। মনে হয় যে আমার বয়স এখন পঁচিশ। এবারে মাছ ধরতে গিয়ে দেখি যে ক্লারার অভাব বেশ অনুভব করছি। বেশ ক'বার ট্রাংক কল্ ক'রে ফেললাম। কী জানো, পালিয়ে যাবার আর দরকার নেই যে, হাঃ হাঃ হাঃ...'

ইংরেজদের মধ্যে এমন আড্ডাবাজ লোক সহজে মেলে না। সকালবেলা ফোন ক'রে চ'লে আসেন। থলেতে থাকে কবিতা, তা ছাড়া ওঁর বাগানের গাজর বা বরবটি। সব্বাইকে ব'লে দেন, 'আমাকে মিঃ বার্কেট ব'লে ডাকবে না। বলবে শুধু "হ্যারি"।' একবার উনি ওঁর অনেক বন্ধুকে ওঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন। আমিও গেছিলাম। পাছে কোন্‌টা ওঁর বাড়ি তা বুঝতে কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় সেজন্য একটা বিরাট নোটিস লিখে বাড়ির সামনে খাড়া ক'রে রেখেছিলেন : 'হ্যারি থাকে এই দিকে।'

আমি ওঁকে বলি, 'হ্যারি, আপনার বঙ্গদেশে জন্মানো উচিত ছিলো। তা হলে কবিতা লেখার আকূতিটাকে অর্ধশতাব্দী ধ'রে চেপে রাখতে হতো না। পাঠক পেতেন, হাততালি পেতেন, হয়তো বা পুরস্কারও জুটে যেতো এতদিনে। ওঁকে দেখতেও খানিকটা বাঙালী কবির শ্বেতাঙ্গ সংস্করণের মতো।

খুব তারিফ করেন আমার বাগানের। উনি তো বিশ্বাসই করতে চান না যে এটা প্রকৃতপক্ষে আমার মালিনী ভূমিকার প্রথম বছর। এক বছরের চেষ্টায় যা করেছি তা নাকি সত্যিই প্রশংসনীয়। কত কী ফুলের নামই জানতাম না, যদিও বছরের পর বছর দেখছি যে তারা আমাদের বাগানে ফোটে। উনি শেখালেন।

কমলা-লাল রঙের অপূর্ব একটা লিলি জাতের ফুলের ঝাড়ে আমাদের বাগান ভর্তি। শিকড়গুলো দেখতে আদার মতো। যাকেই জিজ্ঞাসা করি, নাম জানে না। হয়তো ভ্যালেরি

বলতে পারতো, অথচ ওকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এরিকা বলে যে আয়ার্ল্যাণ্ডে ওগুলো নালায় পর্যন্ত গজায়, কিন্তু নাম ও জানে না। তার পর হ্যারি এসে ফুলগুলোকে খুব আদর ক'রে বললেন, 'মঁব্রিশা, এরা হলো রূপবতী মঁব্রিশা। সুন্দর ফ্লাওয়ার শো দিয়েছে এরা তোমাকে এ বছর।'

॥ বিকেল পাঁচটা ॥ বীজের প্যাকেটের গায়ে ফুলের যে-ছবি দেওয়া থাকে, তার বাহার দেখে আমি একটা প্যাকেট কিনেছিলাম। নাম লিনারিয়া, ওরফে 'পরীদের তোড়া'। কচি চারাগুলো দেখতে ঠিক কিরকম তা জানা নেই। ফুলের বেডে বীজ বুনে ব'সে আছি; কত কী উঠছে; কোন্‌টা যে আগাছা, কোন্‌টা পরীদের তোড়া—কিছু বুঝতে পারছি না। প্রথমে ভাবলাম এটা হবে, পরে ওটা। অবশেষে পানপাতার মতো দেখতে একটা চারাকে নিয়মিত ব্যবধানে উঠতে দেখে ঠিক করলাম, ওটাই হবে।

একটা খটকা ছিলো। ঐ পানপাতার একটা চারা এমন একটা কোণে উঠেছিলো যেখানে কোনো বীজ থাকার কথা নয়। কিন্তু নিজেকে বোঝালাম যে পাখীর মুখে বা বৃষ্টির তোড়ে ঐ বীজটা স'রে গেছে। অতীন আর এরিকা দুজনেই রায় দিলো, 'হ্যাঁ, ওগুলোই লিনারিয়া হবে, বেশ অভিজাত দেখতে।'

অথচ পাশের বেডটাতে, যেখানেও একই বীজ ফেলেছি, অভিজাত পানপাতার অভ্যুদয় না হয়ে হলো একটা আটপৌরে চারার। তপুও একটা ভাঙা গামলাতে প্রচুর বালির সঙ্গে অল্প মাটি মিশিয়ে তাতে ঐ বীজের দুটোকে পুঁতেছিলো। জল ঢালতো খুব। রোদ উঠলেই ওর গামলার বালি-কাদার মিশ্রণটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। অতীন বলতো, মাটিটা একেবারে কম্প্যাক্ট হয়ে গেছে, অঙ্কুরোদ্গম হবে কিনা সন্দেহ। আমি বলতাম, কেন হবে না, বাংলার মাটির মতো দেখাচ্ছে। জল পড়লেই কাদা-কাদা, রোদ উঠলেই চৌচির। সেখানে যদি বীজ ফেটে অঙ্কুর বেরোয়, তবে এই গামলাটাতেও বেরোবে। তার পর তপুর গামলাতেও কত কী উঠতে লাগলো, কিন্তু তারা পানপাতাও নয়, অন্য পাতাটার মতোও নয়। কোন্‌টা ওর চারা বুঝতে না পেরে তপু হাল ছেড়ে দিলো। জলও দিতো না আর। আমিই জল দিতাম, আর শ্যেনদৃষ্টিতে চারাগুলোকে লক্ষ্য করতাম। গামলাটার মাঝামাঝি জায়গায়, যেখানে বীজদুটোকে পোঁতা হয়েছিলো, তারা-তারা পাতার একটা চারার দিকে আমার নজর ছিলো। যদি পাশাপাশি দুটো উঠতো, তৎক্ষণাৎ সন্দেহটা দৃঢ়তর হতো। কিন্তু শুধু একটা ওঠাতে সন্দেহটা একটা হালকা সন্দেহই থেকে গেলো।

তার পর পানপাতায় সমাচ্ছন্ন বেডটার এক কোণে একটা বেশ ছিমছাম তারা-তারা পাতার চারা লক্ষ্য করলাম। মনটা কিরকম খচখচ করতে লাগলো। এটাই কি লিনারিয়া? তা যদি হয়, তবে অন্যগুলো আগাছা, এবং ওগুলোকে অবিলম্বে তুলে ফেলা দরকার। কিন্তু হায়, এতগুলো বীজের মধ্যে মোটে একটিই কি চারা প্রসব করেছে? এই ঘোরতর সন্দেহটা কারও

কাছে প্রকাশ করলাম না। বীজের প্যাকেটের গায়ে যে-ছবিটা ছিলো, তাতে ফুলের সমারোহে পাতার চেহারা বোঝা দায়, কিন্তু খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য করলাম। মনে হলো সেখানে যেন একটা তারা-তারা ভাব ফুটে উঠছে। এরিকার দৃঢ় বিশ্বাস যে পানপাতাগুলোই পরীদের তোড়া।

ইতোমধ্যে অতীন আমাকে বুঝিয়েছে যে সমস্যাটার একটা বৈজ্ঞানিক সমাধান দরকার। অর্থাৎ আরেকটা ট্রে-তে নার্সারির বীজমুক্ত মাটি ছড়িয়ে সেখানে আরও কিছু লিনারিয়ার বীজ ফেলতে হবে। ট্রে-র বীজগুলোর অঙ্কুরোদগম হলেই সমস্যার সমাধান হবে। করলাম তাই।

একদিন সকালে এরিকা আর আমি বাগানে ব'সে চা খাচ্ছি, এমন সময়ে হ্যারি এসে হাজির। 'ওঁকেই জিজ্ঞাসা করো না,' বললো এরিকা, 'উনি তো বাগানের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ।' তার পর পানপাতাগুলোর দিকে হ্যারিকে নিয়ে গিয়ে শুধালে, 'এগুলো কী বলুন তো ?'

চারাগুলোর দিকে মাত্র একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ ক'রে হ্যারি বিনা দ্বিধায় বললেন, 'ওগুলো আগাছা।' পাশের বেডটার আটপৌরে চারাগুলো বিষয়ে উনি কোনো উক্তি পর্যন্ত করলেন না, শুধু নীচু হয়ে সেগুলো উপড়ে ফেলতে লাগলেন। তার পর মৃদুকণ্ঠে শুধালেন, 'কী ওঠার কথা ছিলো ?' ঢোঁক গিলে বললাম, 'লিনারিয়া।'

তপুর গামলাটার কাছে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে চৌচির মাটির কেন্দ্রে অত্যন্ত বিবর্ণ অপুষ্ট একটা তারা-তারা পাতার চারার দিকে আঙুল দেখিয়ে হ্যারি বললেন, 'ওটা লিনারিয়া হবে।'

তার পর ফুলের বড় বেডদুটির আগাছা সরিয়ে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে একটি বেডে তিনটি, অন্য বেডে তিনটি লিনারিয়া পাওয়া গেলো।

'কেন এমন হলো বলা মুশকিল,' বললেন হ্যারি, বোধ হয় তুমি বীজগুলোকে বেশী গভীর ক'রে বুনেছিলে।' আমার অবশ্য বিশ্বাস যে আমি প্যাকেটের গায়ে লেখা নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলাম। 'আসলে বীজেরা খামখেয়ালী পার্টি,' বলেন হ্যারি।

ট্রে-র বীজগুলোকে অগভীর ক'রেই বোনা হয়েছিলো, অথচ সেগুলোরও মোটে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ উঠলো। সব তারা-তারা পাতার। সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানও হলো। যথাসময়ে তাদের ফুলের বেডে বদলি করলাম। এবং শেষ পর্যন্ত, একটু দেরিতে হলেও, পরীদের স্তবক আমাদের মুখরক্ষা করেছিলো। 'বাঃ, অত কাণ্ডের পর বেশ বাহারে হয়েছে তো তোমার লিনারিয়া,' সেদিন বললেন হ্যারি।

কী-একটা বাল্‌ব্‌ এই সেপ্টেম্বরে সবুজ কলি বার করছে। আমি বললাম, 'ক্রোকাস বোধ হয়।' এরিকা গম্ভীর হয়ে বললে, 'হায়াসিন্থও হতে পারে।' হ্যারি বললেন, 'ব্লুবেল হবার সম্ভাবনা বেশী।' লিনারিয়া এপিসোডের পর অতীন এ ব্যাপারে কোনো দৃঢ় মত দিতে প্রস্তুত নয় !

এ চিঠিটা খুব ভারী হয়ে যাচ্ছে রে দোলন, এবারে শেষ করতে হবে। আমার চুড়িদুটো ফেরত পাওয়া গেছে,—আজ দুপুরে নিয়ে এসেছিলো এরিকা।

বৃষ্টির পর কড়া রোদ উঠেছে। তপু সাইকেল নিয়ে এরিকাদের ওখানে গেছে। জপু পিয়ানো বাজাচ্ছে। জপুর নতুন টিচার বলেছেন যে কে কী বারে জন্মেছিলো এবং দৈনিক কত ঘণ্টা টেলিভিশন দ্যাখে তা জানাতে হবে। দ্বিতীয়টা তো হিসেব ক'রে বলা যায়, কিন্তু ওদের জন্মদিনের বারটার আমার মনে নেই। এটা কি জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্লাস নাকি? অবশ্য অতীন এসে হিসেব ক'রে ব'লে দেবে ঠিকই।

এ বছর আমাদের বাগানে অঢেল প্রজাপতি এসেছিলো। তার স্মরণে জপুকে একটা কবিতা লিখতে বলেছিলাম। কী লিখেছে দ্যাখ্।

THE BUTTERFLY

The butterfly lands like a Harrier
on top of a flower
and sucks the nectar through its petrol pipe.
Then it takes off
and goes to the next airport
which is a buddleia,
doing the same thing as before.
Now the butterfly rests its tired wings,
its work done for the day.

বাডলিয়ার ঝোপ আমাদের বাগানে নেই, কিন্তু প্রজাপতিসংক্রান্ত একটা ছবিওয়ালা বই জপুর আছে, এবং সেখানে বলা আছে যে প্রজাপতিরা বাডলিয়া ফুলের মধু খেতে খুব ভালোবাসে। কাজেই ও তথ্যটা জপু ঢুকিয়ে দিয়েছে। বাকি চিত্রকল্পগুলো লক্ষ্য কর্। প্রজাপতির সঙ্গে জঙ্গী বিমানের তুলনা জপু ছাড়া আর কে দেবে? অতীন বলছে যে হ্যারিয়র প্লেনের খাড়া অবতরণ আর টেইক-অফের সঙ্গে যে পরিচিত নয়, সে জপুর উপমাপ্রয়োগের সার্থকতা বুঝতে পারবে না।

তোরা সবাই আমাদের ভালোবাসা নিস্।

ইতি

দিদি

১৪ই সেপ্টেম্বর

স্নেহের নন্দিতা,

বন্যার ভয়াবহ খবরসহ তোমার চিঠিখানা আজকে সকালে পেলাম। খবরটা প্রথমে পেয়েছিলাম আমাদের পুরোনো বন্ধু সরস্বতী বাটলারের মুখে। উনি নর্টন হিলের অক্সফ্যামের শাখায় ভলান্টিয়ারি করেন। ওঁদের দোকানটার সামনে এই ক' দিন আগেই ওঁর সঙ্গে আমার দেখা। আমাকে দেখেই বললেন, 'এই যে, তুমি তো কাগজ পড়ো না, তোমার দেশ যে জলে ভেসে যাচ্ছে তা জানো ?' লজ্জায় পড়লাম। বাড়িতে ফিরে এসে তপুদের বকাবকি করলাম। কারণ বি-বি-সি টেলিভিশনে ছোটদের খবরের আসর থেকে হেডলাইনগুলো আমাকে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব ওদের। ইদানীং ওরা খবর না শুনে রোজ বিকেলে পার্কে যাচ্ছে, নয়তো খবরটা সর্বাগ্রে ওরাই আমাকে দিতো। ছোটদের আসরে তৃতীয় দুনিয়ার খবর একটু বেশীই থাকে।

তার পর নিজেই টেলিভিশনের খবর শুনলাম এবং দেখলাম। রোববারে একটা কাগজ কিনে পড়লাম। এ ক' দিনের মধ্যেই খবরটা আর তত গরম নেই, বেয়াল্লিশ পাতার কাগজে একখানা স্তম্ভ মোটে। সেখানে লিখেছে: 'বন্যার্তদের ত্রাণের জন্য ভারতের সরকার যে অনেক কিছু করছে তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে বন্যানিরোধের জন্য যেসব বাঁধ-ফাঁদ করা হয়েছিলো, সেগুলোর কী হলো ?'

নাঃ, নিয়মিত কাগজ পড়া হয় না। সংসারের সব কাজ নিজের হাতে সামলে, তোমাদের সবাইকে তাড়া তাড়া চিঠি লিখে রোজ কাগজ পড়ার সময় কোথায়, নন্দিতা ? আর খবরের কাগজের যা দাম হয়েছে, উঃ বাব্বা, কিনলেই একটা মানসিক বাধ্যতা আসে, এত দাম দিয়ে কেনা কাগজ না প'ড়ে ফেলে রাখা যায় না, অথচ পড়লেই ঘন্টাকে ঘন্টা সময় নষ্ট হয়, আর মনও খারাপ হয়। ন' বছরের মেয়ে স্কুল থেকে ফেরার পথে উধাও, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না, হয়তো এক সপ্তাহ বাদে তাকে ধর্ষিত এবং মৃত অবস্থায় খানায় পাওয়া যাবে। সাত বছরের ছেলে অন্ধ ও পক্ষাহত, তাকে বাঁচানোর জন্য অত হাজার পাউণ্ড চাই। ছাতার আগায় ইঞ্জেক্শনের ছুঁচ বসিয়ে মানুষ মানুষকে বিষ দিয়েছে। 'ক' দেশের সন্ত্রাসবাদীরা 'খ' দেশের বিমান উড়িয়ে দিয়েছে; 'খ' দেশের জনগণ দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়সংকল্প, তারা বলছে, 'দাঁতের বদলে দাঁত চাই।' 'গ' দেশের গাঁয়ের মেয়েরা পেটের জ্বালায় দলে দলে পতিতাবৃত্তি অবলম্বন করছে, 'ঘ' দেশের হিতৈষীরা তাদের দুঃখলাঘবকল্পে তাদের আফিং

এবং গর্ভনিরোধক বিতরণ করতে ব্যস্ত। 'ঙ' দেশে লাল কেল্লার নীচে পুনরায় যমুনার জল, কালের গালে চোখের জল তাজমহলের উদ্যান প্লাবিত, হাজার হাজার লোক গৃহহীন—

এরই মধ্যে ভক্তদের ভক্তিও আবার অটল, তাঁরা অষ্টপ্রহর সংকীর্তনে ব'সে গেছেন। এঁরা দুঃখবিলাসী। এঁদের বিশ্বাস যে ভগবান যতই আঘাত হানেন, মানুষের ঐহিক পরীক্ষায় উত্তরণ ততই সফল হয়। এঁদের অস্তিত্বের কেন্দ্রে বিশ্বাস, কেন্দ্রটি হারালে বৃত্তটিও যাবে।

এখানকার খবর আপাততঃ বে-খবর: হেমন্তে সাধারণ নির্বাচন হবে না, তাই সবাই নিরাশই যেন। সবাই সবাইকে ভয়ংকরভাবে ঠেস দিয়ে কথা বলছে। রাজনীতিজ্ঞদের বাঁকা বাঁকা কথাগুলো দুমড়ে মুচড়ে আধুনিক আর্ট হয়ে যাচ্ছে। সেদিন টেলিভিশনে 'দ্য গুডিজ্' নামে কমেডি-সিরিজে একটা কার্টুন দেখালো। প্রথমে দেখা গেলো যে ম্যাগি অর্থাৎ মার্গারেট থ্যাচার বক্তৃতা দিচ্ছেন। তার পর দেখা গেলো যে বয়-স্কাউটবেশী একজন 'গুডি' আস্তে আস্তে হামাগুড়ি দিয়ে ওঁর কাছে আসছে। উনি জানেন না, বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। পরের শটে দেখা গেলো যে গুডির হাতে শ্রীমতীর জাঙিয়া, ইঙ্গিত এই যে ও খুলে নিয়েছে। পরের শটে উনি তখনও বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। জানা গেলো যে দুঃসাহসী কাজ করার জন্য বয়-স্কাউট হিসেবে গুডি পুরস্কার পাবে। তোমাদের ওখানে বোধ হয় এ জাতের কার্টুন চলবে না।

আরেকটা কার্টুনে পাদ্রিদের লম্বা পোশাক পরা একটা প্রমাণ সাইজের মুণ্ডহীন পুতুলকে মঞ্চে টেনে আনা হলো। সংবাদদাতা ঘোষণা করলেন: 'দেশের জরুরী অবস্থার দরুন মাননীয় আর্চবিশপ অফ্ ক্যান্টারবেরি পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর পদটিকে একেবারে বাতিল ক'রে দিয়েছেন।' তখন পুতুলটি নিজেই নিজের কাটা ধড়ে হাতুড়ির বাড়ি মেরে ধপাস্ ক'রে পপাত ধরণীতলে।

তোমার দাদা খুবই ব্যস্ত। হ্যাঁ, নতুন প্রতিষ্ঠানটির হালচাল তো ভালোই মনে হচ্ছে। শহরের মাঝখানে বাড়ি পেয়ে গেছে, দিন কয়েকের মধ্যেই টার্ম আরম্ভ হবে। ঘরদোর রঙ করার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। কতগুলো ঘরে কার্পেট বসানো হয়েছে। কাল রাতে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড সোফার কাভার লণ্ড্রোম্যাটের মেশিনে ধোয়া হলো। আজ সকালে সেগুলো রোদে দেওয়া হলো। বিকেলে গ্রীস থেকে একজন ছাত্র ও তার বাবার পৌঁছনোর কথা ছিলো, কিন্তু এইমাত্র আমাদের বাড়িতে ট্রাংক কল্ এলো যে তাঁরা রাতের আগে পৌঁছবেন না। আমি ওদের জানিয়ে দিলাম। শুনে মাননীয়েরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন এবং সম্ভবতঃ হাতুড়ি-পেরেক নামিয়ে রেখে কফি খেতে গেলেন।

এই গত দশ বছরে বিলেতের বৈদেশিক ছাত্রসমাজে কী পরিবর্তনই না এসেছে। এখন তেলের দেশগুলোর টাকাওয়ালা শ্রেণী থেকে বন্যার মতো ছাত্রছাত্রী আসছে। তাদের দেশে তেল আছে, শিক্ষা নেই। খানদানী ঘরের ইরানী মেয়ে মোটরবাইকে চেপে ফিজিক্স পড়তে ছুটছে, সিভিল এঞ্জিনীয়র হবার ইচ্ছা তার। নাইজেরিয়ার মন্ত্রীর মেয়ে বিমানযোগে বই আনতে দেড়শো পাউণ্ডের চেক লিখে দিচ্ছে, সে হতে চায় ডাক্তার। বিজ্ঞান আর যন্ত্রবিদ্যাকে

আয়ত্ত করতে খুবই আগ্রহী এরা, কিন্তু কখনও কখনও এদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাণ্ডার্ডে টেনে আনতে রীতিমতো খাটতে হয়। এদের কারও কারও ধারণা যে স্রেফ্ মুখস্থ ক'রে বিজ্ঞান শেখা যেতে পারে, কিংবা শেখার পথে এমন কোনো শর্ট্‌কাট্ আছে যেটার কথা মাস্টাররা ফাঁস করছেন না।

তোমার দাদার বিশেষ পছন্দ সিরিয়া আর লেবাননের ছাত্রদের। এরা পড়াশোনায় যেমন সিরিয়াস তেমনই টন্‌টনে এদের রাজনৈতিক চেতনা। কেমন মাথা উঁচু ক'রে চলে, মুখ তুলে টকাস্ টকাস্ কথা বলে। চেহারাগুলোও দারুণ। আমাদের মামীমাসীরা এদের দেখলে জামাই ক'রে নিতে চাইতেন। আমার তো মেয়েটেয়ে নেই।

অবশ্য এই ইচ্ছার শাশুড়ী হওয়ার দুঃখও আছে। এই তো কাল রাতেই একটা খারাপ খবর এসেছে। তোমার দাদার খুবই প্রিয় একজন লেবানিজ় ছাত্র, যার এই টার্মে বিলেতে ফিরে আসার কথা ছিলো, বেইরুটের গণ্ডগোলে মারা গেছে। চল্লিশটা গুলি লেগেছিলো বেচারীর গায়ে। গত জুলাই মাসে শেষ দেখা তার হাসিতে উজ্জ্বল মুখখানি।

॥ রাত সাড়ে আটটা ॥ কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমাকে লেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু আজকের দিনটা কেমন যেন ছেঁড়া মেঘের মতো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কাজের চাপ বড্ড বেড়েছে।

ঘরের কোণে, সিঁড়িতে—সর্বত্র ধুলো জমেছে। ইস্ত্রি করার জামাকাপড় জ'মে আছে। রান্নাঘরের মেঝেটা এই সেদিন ধুলাম, আবার আঠা-আঠা হয়ে গেছে। আমার নিজের মাথার চুলও মাথা ঘষবার চার দিনের মধ্যে শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। পিঠ-কাঁধ সব ব্যথা করছে। তোমার দাদাটি খেয়ে আবার বেরিয়ে গেছে, তপু গেছে সঙ্গে। ফিরতে কত রাত হবে কে জানে। কালকে তপুদের স্কুল আছে।

গ্রীক ভদ্রলোক—নামখানা খাসা, বায়রন ক্রিতিকস্—পুত্রসহ বিলেতে পৌঁছে গেছেন। হীথরো এয়ারপোর্ট থেকে ছ'টার সময়ে টেলিফোন এলো। নর্টন হিলের সব থেকে শৌখিন হোটেলটিতে উঠবেন। এই বড়লোক গ্রীকদের ব্যাপারই আলাদা। তোমার দাদা তাঁকে বললে কাল সকাল দশটায় অফিসে দেখা করতে, তার পর খেয়েই আবার ছুটলে অফিসে। কালকে সকালের মধ্যে অন্ততঃ একটি ঘরকে কেতাদুরস্ত করা চাই। সোফাগুলোতে কাভার পরাতে হবে, কার্পেটে ভ্যাকুয়াম ক্লীনার চালাতে হবে, ইত্যাদি। বিদ্যুতের জন্য দশ দিন ধ'রে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ইলেক্‌ট্রিসিটি বোর্ড থেকে কেউ কানেক্‌শন ক'রে দিতে আসে নি এখনও। পাশে একটা ছাপাখানা আছে, সেখান থেকে লম্বা তারে কানেক্‌শন এনে কাজকর্ম হচ্ছে আপাততঃ। তপু গেছে আলো ধরবার জন্য, বুঝলে তো ? ও আলো ধ'রে থাকবে, তবে কাজ হবে, বোঝো দেখি। ও তো মহা খুশী, রাত জাগতে পারলে আর কিছু চায় না। দেশের ছেলেরা যেমন ঝাল খেয়ে বড় হয়, বিলেতের ছেলেরা তেমনই রাত জেগে বড় হয়। ফিরে আসবে তারা-তারা চোখ ক'রে, যেন টেনে টেনে খুলে রাখছে চোখদুটিকে। যদি বলা হয়,

'এই রে, তপুর চোখ ঘুমে ঢুলুঢুলু হয়ে আসছে,' অমনি প্রতিবাদ করবে : 'কক্ষনো না, এই তো চোখ খোলা, দিব্যি জেগে আছি।'

জপুর আবার হাঁপানি হয়েছে। এ বছর খুব ভুগলো কিন্তু হাঁপানিতে। এখন নিজেই ইনহেলারটা ঠিকমতো ম্যানেজ ক'রে নিতে পারে।

আমাদের বাগানের আপেলে এ বছর যা স্বাদ হয়েছে না! অনেক আপেল ঘরে আনা হয়েছে। কিছু দিন আগে বৃষ্টির পর যেই রোদ উঠলো, অমনি দলে দলে জন্ম নিলো এক বিশেষ জাতের শুঁয়োপোকা, যারা জ'ন্মেই ন্যাস্টার্শিয়াম আর বাঁধাকপির পাতা খায়, এবং অতঃপর সাদা প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়। বারো ঘণ্টার মধ্যে আমার ন্যাস্টার্শিয়ামের বেডগুলির যা দশা করলো না! শুধু যে পাতা খায় তাই নয়, ফুল এবং কুঁড়িও। তপু আর জপু মিলে মহাড়ম্বরে কাঠি দিয়ে শুঁয়োপোকা তুলে তুলে বালতির জলে ফেলতে লাগলো, কিন্তু ওভাবে কি পারা যায়? একটা তোলে তো আরও দশটা বেরোয়! শেষে আমাদের পরিচিত এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে টেলিফোন করলাম। উনি একটা পোকানাশক পাউডারের নাম বললেন, সেটা কিনে আনলাম। সেটা দেওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে উৎপাত ক'মে গেলো। পরের দিন সকালে ভদ্রলোক নিজে এসে হাজির। ফুলের বেডগুলি পর্যবেক্ষণ করলেন, নিজে আবার পাউডারটা দিলেন, কাঠি দিয়ে দু'-একটা আধমরা শুঁয়োপোকা তুললেন, তার পর আমার উদ্দেশে লেখা একটি কবিতা পাঠ করলেন, এবং চা-বিস্কুট ধ্বংস করলেন। এরিকা গ্রেগ বলে, 'ভদ্রলোক তোমার প্রেমে পড়েছেন।' তা আমাকে কারও ভালো লাগলে আমি কী করতে পারি বলো তো? ভদ্রলোকের গল্প শুনতে বেশ লাগে আমার।

ফতিমা হাচিনসন আলজেরিয়া থেকে ফিরেছে সপ্তাহ দুয়েক আগে। ভালোভাবেই হয়ে গেছে ওর ভাইয়ের বিয়ে। দেশ থেকে ফিরে এসে ফতিমা আর এরিকা দুজনেই কিছু দিন বেশ তাজা আর উত্তেজিত থাকে। তার পর আবার শুরু হয়ে যায় যার যা আধি-ব্যাধি। এরিকার জিভে ঘা হয়, ফতিমার ঘাড়ে ব্যথা হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি। বাজার করতে করতে, বাসন ধুতে ধুতে, ছেলেমেয়েদের পিছনে দৌড়তে দৌড়তে পরনের এপ্রনের মতোই মলিন হয়ে যায় জীবনটা। তখন বড় জোর তাকে ঘ'ষে-মেজে একটা সন্ধ্যের জন্য চকচকে করা।

যেমন আমরা করেছিলাম রেবামামীর অনারে। রেবামামী এখানে ছিলেন মোটে দু' দিন। এসেই বললেন, 'কী রে, তোদের নর্টন হিলে কৃষ্টি-টৃষ্টি কিছু আছে কি?' এমনই আমাদের সৌভাগ্য যে সে-রাত্তিরেই একটি কবিতার আসর। আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর পর আসর চলতে থাকে পাবে। সেদিন যদি দেখতে এরিকা গ্রেগের কাণ্ডখানা। 'এই, তোমার আন্টিকে বৃস্টল ক্রীম শেরি আরেকখানা দাও। আরে দাঁড়াও, আমিই দিচ্ছি।' ইত্যাদি। রেবামামী অনেকবার বললেন, একখানা বৃস্টল ক্রীম শেরিই তাঁর পক্ষে পর্যাপ্ত হয়েছে, এবারে কমলালেবুর রস হলেই তাঁর চলবে, কিন্তু এরিকা কর্ণপাত করলে না। অবশ্য রেবামামীও

মুগ্ধ। এমন মিষ্টি আর সহৃদয় মেয়ে। তার পরের দিন বেবামামীকে কৃষ্টির তীর্থস্থল শেক্সপীয়রের জন্মস্থান স্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-এভনে নিয়ে যাওয়া হয়।

দেখছি যে তপু-জপু দুজনেই দাবা খেলার ক্লাবে নাম লিখিয়েছে। তা ছাড়া ওরা সাঁতারটাও বেশ শিখে গেছে। কিন্তু ইদানীং তোমার দাদা এত পাগলের মতো ব্যস্ত যে দিন কতক ধ'রে না হচ্ছে ওদের অঙ্ক, না জপুর বাজনা।

কিন্তু ইতোমধ্যে স্কুলে ব'সে তপু তার জীবনের প্রথম কবিতা লিখেছে। দ্যাখো।

THE SEA

The waves like the dog barking.
The waves rolling on the shore like
the dog turning over and over.
The dog runs like the waves.
The ripples on the sand like the
fur of a dog.

আমি তো অবাক। প্রথমে বিশ্বাসই করি নি। বলেছিলাম, 'দূর, তুই টুকেছিস কোনো বই থেকে।' ও বললে, 'কক্ষনো না, তুমি জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো আমার মাস্টারমশাইকে। প্রথমে উনি সমুদ্র বিষয়ে কতগুলো কবিতা ক্লাসে আমাদের প'ড়ে শোনালেন। তার পর আমরা যে-যার নিজের ভাষায় কবিতা লিখলাম।'

ওদের ক্লাসে গিয়ে দেখি, সত্যিই তপুর কবিতাটা দেয়ালে ঝুলছে। ওর মাস্টারমশাই মিঃ কাওয়েল বললেন যে দেয়ালে যা-কিছু ঝুলছে সবই বালকবালিকাগণের স্বকীয় কীর্তি।

কবিতাটার মধ্যে মজার ব্যাপার হলো 'like' শব্দটার ব্যবহার। নিজের রচনার মানে আমাকে তপু বোঝালো এভাবে: 'সমুদ্রের ঢেউগুলো কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাকের মতো। তারা বালির উপরে আছড়ে পড়ছে, ঠিক যেমন কুকুর গড়াগড়ি দেয়। কুকুরটা দৌড়চ্ছে, ঢেউয়ের মতো। বালির তীরটা কুঁচকে আছে, কুকুরের লোমের মতো কোঁকড়া।'

তখন ওকে বোঝালাম যে তা হলে ওকে এভাবে লিখতে হবে:

THE SEA

The waves are like the dog barking.
The waves rolling on the shore are like
the dog turning over and over.
The dog runs like the waves.
The ripples on the sand are like the

fur of a dog.

এই সংস্করণটা কিন্তু তপুর ততটা পছন্দ নয়। আমার নিজেরও প্রথম পাঠটাই বেশী পছন্দ। আসলে তপুর অজ্ঞাতে ওর কলম দিয়ে প্রথম বারেই আধুনিক কবিতা বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় পাঠটার অর্থ স্রেফ সোজা : অমুক অমুকের ন্যায়। কিন্তু প্রথম পাঠটার মধ্যে একটা বাহাদুরি, একটা জটিলতা আছে। ঢেউগুলো কুকুরটাকে পছন্দ করে, কারণ,—তুলনাটা প্রচ্ছন্ন—কুকুরটার ঘেউ-ঘেউ ডাক আর গড়াগড়ি ঢেউদের শব্দ আর ভেঙে পড়ার মতোই। তারা ভ্রাতৃতুল্য। চতুর্থ লাইনের সহজ বক্তব্যটি সমে আসার মতো। তার পর আবার অলংকরণ : বালির কুঞ্চনগুলিও কুকুরের লোমকে পছন্দ করে, তারাও ভ্রাতৃতুল্য। সাবাস!

কিংবা না, তাও না। কবিতাটা আরেকবার প'ড়ে আমার মনে হচ্ছে যে 'লাইক' বলতে তপু পছন্দ করা-টরা নয়, সাদৃশ্যই বুঝিয়েছে। অমুক অমুকের মতো—ঐ কথাই ও বলতে চেয়েছে, আর ওর বলার ভঙ্গিটির বিশেষত্ব ঠিক এইখানেই যে ওর কবিতাটির প্রথম, দ্বিতীয় আর পঞ্চম লাইনে ও সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাদ দিয়ে গেছে। সমাপিকা ক্রিয়া আছে কেবল চতুর্থ লাইনে, যেখানে কুকুরটা দৌড়চ্ছে—ঢেউয়ের মতো। অন্যত্র ও সম্পূর্ণ বাক্য রচনা করে নি, কেবল বাক্যের টুকরো সাজিয়ে দিয়েছে। কাজটা বোধ হয় বাংলায় সহজতর হতো। 'ঢেউগুলো যেন ঘেউ-ঘেউ করতে থাকা কুকুর' ইত্যাদি। ইংরেজীতে সমাপিকা ক্রিয়াপদ বাদ দিলে অভিপ্রেত অর্থকে সব সময়ে বাঁচানো যায় না। 'লাইক' শব্দটা ওখানে বড্ড দ্ব্যর্থক হয়ে গেছে। 'মতো', না 'পছন্দ করে' ?—কবিতাটা যে পড়বে তার মনে এ প্রশ্ন জাগতে বাধ্য। কিন্তু দাঁড়াও, নন্দিতা, তপুর অভীষ্ট অর্থটাকে স্পষ্ট এবং দ্বিধামুক্ত করা যায় যতিচিহ্ন ব্যবহারের দ্বারা। এই দ্যাখো—

THE SEA

The waves—like the dog barking.
The waves rolling on the shore—like
the dog turning over and over.
The dog runs like the waves.
The ripples on the sand—like the
fur of a dog.

এবার হয়েছে, তাই না ?

এইমাত্র ফিরলো ওরা। তপু বলছে যে একটা ঘর নাকি দারুণ সুন্দর হয়ে গেছে। কালকে ওখানে মিঃ বায়রন ক্রিতিকস্‌কে স্বাগত জানানো হবে। পরে ওটা হবে ছাত্রদের কমনরুম।

আমি আশা ক'রে আছি যে মিঃ ক্রিতিকস্ এথেন্সে একটা পার্সেল নিয়ে যাবেন আমাদের বন্ধুদম্পতী দিমিত্রিয়াদিস্‌দের জন্য। দেশ থেকে আনা তিনটি উপহার এক বছর ধ'রে আমার দেরাজে প'ড়ে আছে : টুকিটাকি খাবার পরিবেশনের জন্য একটি স্টীলের থালা, কর্তার জন্য একটি রেশমী টাই, গিন্নীর জন্য একটি ছাপা লুঙ্গি। রিকশাওয়ালারা যে-ছাপা লুঙ্গিগুলো পরে—ছাপগুলো দেখতে খানিকটা বাটিকের কাজের মতো, কিন্তু আসলে তা নয়—সেরকম বেশ কয়েকটা কিনে এনেছিলাম, মনে আছে তোমার ? আমার এখানকার বান্ধবীদের খুব পছন্দ হয়েছে ওগুলো।

আজকের মতো এখানে শেষ করি, নন্দিতা। বাইরে খুব বাহারে চাঁদ উঠেছে।